মুনির হাসান

বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপ

বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপ

মুনির হাসান

আদর্শ

প্রকাশক: **আদর্শ**
৩৮ পি. কে রাম রোড়, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
+০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০
info@adarsha.com.bd
www.adarsha.com.bd
www.facebook.com/Adarsha Fb

বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপ ১ম প্রকাশ:
৩ চৈত্র ১৪২৭; ১৭ মার্চ ২০২১

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: আদর্শ প্রিন্টার্স
রকমারিতে আদর্শর বই: www.rokomari.com/adarsha

Billion Dollar Startup (Published in Bengali)
by Munir Hasan
Published by Adarsha
38 P, K, Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100
ISBN : 978-984-95500-6-8

উৎসর্গ

ইকবাল জেড কাদির

প্রতিষ্ঠাতা, গ্রামীণফোন

দেশে বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপের সূচনা করায়

আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা

সূচি

ভূমিকা

গণিত অলিম্পিয়াড শুরুর পর থেকে আমাদের বেশির ভাগ ঘটনার শুরু ওখান থেকে। শুরুতে আমরা নানা কিছু করতাম। যেমন প্রতিবছর একটা আলাদা থিম রাখা। এক বছর ছিল আমাদের ধান, আমাদের মান'। বাংলার হাজার জাতের ধানের কথা আমরা আমাদের ডাচ্-বাংলা ব্যাংক প্রথম আলো গণিত উৎসবে বললাম। আর একবার করলাম 'আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতি'। সেবার সংস্কৃতিজগতের নানা কিছু আমরা উৎসবে যুক্ত করার চেষ্টা করি। ২০১১সালের উৎসবের সময় আমরা ভাবলাম দেশে উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যাপারটাকে প্রমোট করা যাক। কীভাবে করব? প্রতিটি উৎসবে একজন স্থানীয় উদ্যোক্তা হাজির হয়ে তার গল্প বলবেন। তারপর জাতীয় উৎসবে দুজন উদ্যোক্তা আসবেন। সেই সময় *প্রথম আলোর* 'স্বপ্ন নিয়ে' পাতা দেখতেন ফিরোজ জামান চৌধুরী। উৎসব শেষে বললেন, উদ্যোক্তার ব্যাপারটা নিয়ে একটা লেখা লিখে দেন। আমি একটা লেখা লিখলাম। অন্য রকম গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ আর ফিরোজ জামানের হাত ঘুরে সেটার শিরোনাম হলো, 'চাকরি খুঁজব না চাকরি দেব। মানে সহজ। এখানে একদল লোকের কথা বলা হলো, যারা আসলে চাকরির প্রতি আগ্রহ না দেখিয়ে নিজেরা উদ্যোক্তা হবেন। লেখার শেষ লাইনটা ছিল, পথে নামলে পথ চেনা যায়। সেটি ২০১১ সালের ৭ এপ্রিলের কথা। ওই লেখা প্রকাশের পর কয়েকজনের সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা। কীভাবে এই উদ্যোক্তাসহায়ক কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। শেষমেশ এর

ছয় দিন পর ১৩ এপ্রিল ফেসবুকে একটা গ্রুপ খোলা হলো 'চাকরি খুঁজব না চাকরি দেব' (https://www.facebook.com/groups/uddokta) নামে। কালক্রমে সেটা একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে গেল। সেখান থেকে নানা কিছু আমরা করছি। উদ্যোক্তা হাট, উদ্যোক্তা সম্মাননা, সভা-সমিতি, সেমিনার, কর্মশালা, বুট ক্যাম্প ইত্যাদি। তো এসব করতে গিয়ে আমাকে প্রচুর পড়াশোনা শুরু করতে হলো। নানা কিছু পড়ি। সেটা নিয়ে আলাপ করি। পড়তে গিয়ে টের পেলাম আমাদের দেশে উদ্যোক্তা, বিজনেস কিংবা মার্কেটিংয়ের বইপত্র সবই পাঠ্যপুস্তকের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেখান থেকে যে বের হবে, সেটাও খুব একটা বোধ হচ্ছে না। ভাবলাম তাহলে বই লেখা যাক। কী নিয়ে লিখব?

দেখলাম আমাদের নবীন উদ্যোক্তাদের একটা বড় অংশই মার্কেটিংয়ে হাবুডুবু খায়। লিখলাম *গ্রোথ হ্যাকিং মার্কেটিং।* অনেকেই পড়লেন। তারপর লিখলাম *শরবতে বাজিমাত।* তিন ব্রিটিশ উদ্যোক্তার গল্প। এবার মজার কিছু ঘটনা দেখলাম। অনেকে জানাল তারা এই বই পড়ে উদ্যোক্তা হওয়ার শক্তি পেয়েছে। ২০২০ সালেও *ইমোশনাল মার্কেটিং* নামে একটা বই লিখেছি। এর মধ্যে লক্ষ করলাম আমাদের মার্কেটিং গুরু, অধ্যাপকরা মার্কেটিংয়ের বই লিখতে শুরু করেছেন। প্র্যাকটিশনাররাও এখন দুই হাতে লিখছেন। ভাবলাম আমরা আর এ লাইনে না গেলেও চলবে।

২০২০ সালে করোনা আসার পর ভাবলাম 'ধাপে ধাপে গ্রোথ হ্যাকিং' নামে একটা বই লিখি। উদ্দেশ্য থাকবে সহজ। গ্রোথ হ্যাকিংয়ের গুরুদের জানানো পদ্ধতিগুলো ধাপে ধাপে কেমনে প্রয়োগ করা যাবে, তার একটা দলিল। কিন্তু কে জানি (নাম ভুলে গেছি) বলল বই না লিখে একটা কোর্স করান। এতে যেকোনো পরিবর্তন ও নতুন কিছু সহজে সমন্বয় করা যাবে। সেই ভাবনা থেকে ই-মেইলে গ্রোথ হ্যাকিং মার্কেটিং নামে একটা কোর্স (https://www.munirhasan.com/courses/ghm_email/) চালু করেছি। সেটি এখন চালু আছে।

তো হ্যাকিং নিয়ে তাহলে আর বই লেখার দরকার নেই। তাহলে কী লিখি? হাত তোনিশপিশ করে, এই সময় মনে পড়ল ই-জেনারেশনের শামিম আহমেদ তার সাম্প্রতিক একটি লেকচারে বাংলাদেশের স্টার্টআপের একটা স্বপ্নের কথা বলেন। ২০২৫ সালের মধ্যে ৫টি ইউনিকর্ন তৈরি করা। ইউনিকর্ন হলো একটি কাল্পনিক প্রাণী। যেসব স্টার্টআপের ভ্যালুয়েশন ১ বিলিয়ন ডলার হয় তাদের বলা হয় ইউনিকর্ন। ভাবলাম ইউনিকর্নের খবর নেওয়া যাক।

প্রথমে বোঝার চেষ্টা করলাম বিলিয়ন ডলার মানে কত টাকা? শূন্য ঠিকঠাকমতোবসিয়ে সেটিকে ৮৫ টাকা দিয়ে গুণ করার পর বুঝলাম ঘটনাটি জটিল। কারণ, টাকার পরিমাণ হচ্ছে ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা !!! এত টাকা কেমন করে হিসাব করা যায়। তারপর দেখলাম হাতের কাছে আছে আমাদের পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু বানাতে খরচ হচ্ছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। তার মানে চার বিলিয়ন ডলারের একটু কম। টাকার অঙ্ক বোঝার পর একটু মন খারাপ হয়ে গেল। বুঝলাম কঠিন কাজ।

তারপর ভাবলাম, না দেখি অন্যদের ইউনিকনগুলো কেমন করে ইউনিকর্ন হয়েছে। তোসে জন্যই বিলিয়ন ডলারের কোম্পানিগুলোর খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম। তারপরই সাহস ফিরে পেলাম। কারণ, এগুলোর কোনোটিই মঙ্গলগ্রহের প্রতিষ্ঠান নয়। এমন বিশাল কোনো ঘটনাও নয়। তাহলে তারা কেমন করে ইউনিকর্ন হলো?

সেটা জানার জন্যই এই বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপ।

২

তো, বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সেখান থেকে ১০-১২টা কেমন করে বাছাই করব? ভাবলাম আগে পড়ি, জানি। তারপর নিজের মতোকরে বাছাই করি। শেষমেশ যেগুলো এই বইয়ে এসেছে, সেগুলোর মূল আইডিয়া কিন্তু আলাদা। মানে দুটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের স্টার্টআপ কিন্তু এখানে নেই। চেষ্টা করেছি আইডিয়ার বৈচিত্র্য ধরতে। এর মধ্যে আমি একটা বিষয় বুঝে

ফেলেছি, সেটা হলো আইডিয়ার খুব বেশি দাম নেই। লোকে বরং দেখে যে কাজটা হচ্ছে, সেটা কেমন, এগোতে পারবে কি না। অনেক সময় সিনিয়ররা ঠিকই পাশ কাটিয়ে যান। এয়ারবিএনবির কথা ধরা যাক। শুরুতে এর উদ্যোক্তারা ১৫ জন বিনিয়োগকারীর শরণাপন্ন হন। তাদের মধ্যে ৮ জন কোনো উৎসাহ দেননি। ৭ জন তো সময়ই দেননি। অন্যদিকে ফেসবুকের বেলায় মনে হবে সবাই বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। ইয়াহু, গুগল, মাইক্রোসফট- সবাই। কাজেই বিনিয়োগের কেমেস্ট্রি বোঝার ব্যাপারটা খুব বেশি জটিল মনে হয়নি। তারপর দেখলাম সব কোম্পানিই একটা দর্শন তৈরি করে নিয়েছে কর্মী রিক্রুট করার আগে। এটার ফলাফলই টের পেয়েছি। সবারই অসাধারণ টিম। এই কেমেস্ট্রিটা হলো সেটা, যার কারণে শেরি শ্যান্ডবার্গ গুগল থেকে এসে ফেসবুকের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা হন। এর মধ্যে নেটফ্লিক্সের ব্যাপারটাও জানা গেল। 'নো রুলস, রুলস' হলো ওদের নীতি। সেখানে কর্মীরা যখন খুশি তখন ছুটি নিতে পারেন। অদ্ভুত। অথচ তারা অস্কার পাওয়া মুভি বানায়! স্টার্টআপগুলোর কালচার এমন হয় যে সেখানে চাকরি করলেও লোকের উদ্যোক্তা মনোভাব চাঙা হয়ে ওঠে। এ কারণে দেখা যায় পেপালের উদ্যোক্তা ও প্রথম ৫০ কর্মীর অর্ধেকই পরবর্তী সময়ে নিজেরাই ইউনিকনের জন্ম দিয়েছে! পশ্চিমাজগত তাই আদর করে তাদের 'পেপাল মাফিয়া' নামে ডাকে।

তাদের মধ্যে একটা দারুণ মিল দেখেছি। সবাই নিজের ব্যবহারকারীকে অসম্ভব দাম দেন। তাদের যত্ন করেন। তাদের নিয়ে ভাবেন। বোঝা যায় এটুকু আছে বলে তারা লাখো-কোটি কাস্টমার পান। পৃথিবীর প্রতি তিনজন বাসিন্দার একজন ফেসবুক ব্যবহার করে। এয়ারবিএনবি বছরজুড়ে হোস্টদের নিয়ে মিটআপ করে। তার সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠানও হোস্টদের নিয়ে।

যেগুলো তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, সেগুলোও মুক্ত দর্শনের অনুসারী। ফেসবুক যেমন তার এপিআই উন্মুক্ত করে দিয়েছে ডেভেলপারদের জন্য। ফলে ফেসবুককে কেন্দ্র করেই টেকাটুকার সমাধান হয়ে গেছে এক বড় ডেভেলপার গোষ্ঠীর।

তবে আমি শুধু আইটি কোম্পানিতে থাকিনি। খুঁজে বেড়িয়েছি অন্যদেরও। তাই ঈসা ভাইদের পেট্রলপাম্পের কথাও এসেছে। শুধু আমেরিকাতে না থেকে অন্যত্রও দেখেছি।

গল্পগুলো একই। যত না আইডিয়া তার চেয়ে বেশি ইমপ্লিমেন্টেশন। দলীয় কাজ। দাঁতে দাঁত চেপে লেগে থাকার গল্প। বেশির ভাগ সময়ই বড় ভাইয়েরা মানা করেছেন। সবাই বলেছেন, ইট উইল নেভার ওয়ার্ক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তার জেদ, উদ্যম আর কাজের নিষ্ঠারই জয় হয়েছে।

উদ্যোক্তারা বেশির ভাগই তরুণ। এই বই তাই তারুণ্যের জয়জয়কার। তাদের বিজয়ের কাহিনি।

৩

এই বই কেমন করে লিখেছি? সহজ কোনো রাস্তা পাইনি। কারণ, অনেক উদ্যোক্তাই এখন পর্যন্ত নিজে কোনো বই লেখেননি। তবে পশ্চিমাদের একটা বড় গুণ হলো কেউ না কেউ বইগুলো লিখে ফেলেছেন। কাজেই পেপাল হোক, ফেসবুক হোক বা এয়ারবিএনবি হোক, বই লেখা হয়েছে। আমি চেষ্টা করেছি ইনফোগুলো বই থেকে নিতে। সঙ্গে উইকিপিডিয়া আর মিডিয়াম ব্লগে লেখা নানা নিবন্ধ। আর সবশেষে কিছু বিখ্যাত মার্কেটিং সাইট যেমন হাবট, গ্রোথ হ্যাকিং আইডিয়ার লেখা। বেশ কিছু কোম্পানিকে নিয়ে কেস স্টাডি লেখা হয়েছে হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ এবং অন্যান্য মিডিয়ায়। সেগুলোও দেখেছি। আমি অবশ্য কেস স্টাডি লিখতে চাইনি। শুধু গল্পটা বলতে চেয়েছি। কোনো কোনো গল্প খুবই সংক্ষেপে বলেছি। কোনো কোনাটো বিস্তারিতভাবে বলেছি। কারণ হলো যে গল্পটা বা বলা ভালো উদ্যোক্তাদের লড়াইটা জটিল, সেটাতে সময় বেশি দিয়েছি। যেটা সহজ মাটোমুটি, সেখানে গল্পটা বলেছি। লেখার সময় জটিল কারিগরি দিক নিয়ে মাথা ঘামাইনি। যেমন এয়ারবিএনবি কর্তৃক ক্রেইগলিস্ট হ্যাক করা। এটার কারিগরি দিকে না গিয়ে বাইরে থেকে দেখেছি। কারণ, এ ধরনের কাজ নানাভাবেই করা সম্ভব। সেটি প্রোগ্রামারদের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিলাম।

৪

এ বইটি আমি উৎসর্গ করেছি বাংলাদেশে আধুনিক স্টার্টআপ ধারণার প্রবর্তক ও গ্রামীণফোনের প্রতিষ্ঠাতা ইকবাল কাদিরকে। আমাকে যারা চেনেন, তারা সবাই জানেন আমার জীবনের মোটোগুলোর প্রধান হলো। কানেকটিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি (সংযুক্তিই উৎপাদনশীলতা)। এই জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে সারা দেশে ব্রডব্যান্ড পৌঁছে দেওয়ার দাবি করে আসছি। কানেকটিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি এই দর্শনের প্রবক্তা ইকবাল কাদির। বর্তমানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর। কাজ করছেন তৃতীয় বিশ্বে এন্ট্রাপ্রেনিউর ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। ২০২০ সালে তার একটি ইন্টারভিউ করেছি আমি প্রথম আলোর টেপটক অনুষ্ঠানে। সেখানে অনেক কথাই বলেছেন। সবচেয়ে ভালো লেগেছে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের তুলনার বিষয়টি। বলেছেন, আজ থেকে ১০০ বছর আগে উন্নত অনেক রাষ্ট্রই আমাদের বর্তমান অবস্থার মতোছিল। তারা যদি পারে, তাহলে আমরা পারব না কেন।

সেটাই কথা। আমরা পারব। আমার মতোকেউ একজন তখন আমাদের ইউনিকনের গল্প লিখবে।

পেপাল মাফিয়া

চিত্র ১: ফরচুনে প্রকাশিত পেপাল মাফিয়ার সেই বিখ্যাত ছবি

ছবিটা ছাপা হয়েছে ফরচুন ম্যাগাজিনের ২০০৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সংখ্যায়। মিট দ্য পেপাল মাফিয়া' শিরোনামের এই স্টোরিতে প্রথমবারের মতোপেপালের কর্মী ও উদ্যোক্তাদের একটি দলকে 'মাফিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ছবিতে রয়েছে জাওয়েদ করিম, জেরেমি স্টপেলম্যান, এন্ড্রু ম্যাক করমেক, প্রিমল শাহ, লুক নোসেক, ক্যান হোয়েরি, ডেভিড ও স্যাক, পিটার থিয়েল, কিথ রোবইস, রিড হফম্যান, ম্যাক্স লেভচিন, রোয়েলভ বোথা, রাসেল সিমন্স। এলন মাস্ক এই ছবিতে নেই। কারণ, শিডিউল মেলাতে পারেননি। তবে ম্যাগাজিনের জন্য আলাদা ছবি তুলেছেন। ২০০২ সালে ই-বে পেপালকে কিনে নেয় মাত্র ১.২ বিলিয়ন ডলারে। পেপালের প্রথম ৫০ কর্মী ও উদ্যোক্তার মধ্যে ১২ জন ছাড়া বাকিরা তখন সেখান থেকে

বের হয়ে আসেন। এই ৩৮ জনের সবাই পরে আলাদাভাবে বা একা একা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি হলো Tesla, Inc., LinkedIn, Palantir Technologies, SpaceX, Affirm, Slide, Kiva, YouTube, Yelp ও Yammer। ফরচুন ম্যাগাজিন তাদের গ্যাংস্টারের মতোছবি তুলে তাদের টাইটেল দিয়েছে পেপাল মাফিয়া।

এই মাফিয়া গ্যাংয়ের গল্পের শুরু ১৯৮৬ সালে আমেরিকা থেকে অনেক দুরে রাশিয়ার চেরনোবিল দুর্ঘটনায়। সে সময় চেরনোবিল থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে বড় হচ্ছিলেন ম্যাক্স লেভচিন। লেভচিনের মায়ের কাজ ছিল খাদ্যে তেজস্ক্রিয়তা যাচাই করে সার্টিফিকেট দেওয়া। চেরনোবিলের দুর্ঘটনার পর যখন তেজস্ক্রিয় খাবারের পরিমাণ বাড়তে থাকে, তখন অফিসে তাকে একটি কম্পিউটার দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য সহজে ডেটা সংরক্ষণ করা। লেভচিনের মা নিজে কোডিং শেখার সময় ছেলেকেও সঙ্গে নিলেন। ব্যাপারটি কিশোর লেভচিনকে এত উৎসাহিত করে যে যেদিন মায়ের সঙ্গে অফিসে যাওয়া হতোনা, সেদিন সে বাড়িতে বসে খাতা-কাগজে প্রোগ্রাম লিখত। এই শখই বড় হয়ে উঠল যখন তারা পারিবারিকভাবে আমেরিকায় পাড়ি দিল। সেখানে লেভচিন। আরবানা শ্যাম্পেইনে ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে ভর্তি হলো। এই সময় তার নিজের একটা কম্পিউটার হলো এবং ল্যাবেও কাজের সুযোগ হলো। তার এই কোডিং প্রতিভা দেখে কয়েকজন সহপাঠী তাকে নিয়ে স্টার্টআপ গড়ার চেষ্টা করল। এভাবে তিন বছরে চার-চারটে স্টার্টআপের জন্ম দিয়ে কোনাটোতেই তারা সফল হলেন না। পাস করতে না করতেই বন্ধুরা চলে গেলেন সান ফ্রান্সিসকোতে, সিলিকন ভ্যালিতে। লেভচিন আরও কিছুদিন ইলিনয়ে ঘোরাঘুরি করে একদিন সকালে সিলিকন ভ্যালিতে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে। জানতে পারেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পিটার থিয়েল নামের একজন বিনিয়োগকারী, অ্যাকটিভিস্ট, আইনজীবী ও উদ্যোক্তা একটি বক্তব্য দেবেন। লেভচিন ওই ছয়জন দর্শকের একজন হিসেবে ওখানে যোগ দেন এবং থিয়েলকে জানান তিনি একটি কোম্পানি করতে চান।

থিয়েলের কাছে লেভচিনের প্রস্তাবিত কোম্পানির কাজটা জটিল। সে সময় লেভচিনের ধ্যানজ্ঞান ছিল কম্পিউটার নিরাপত্তা। কাজে তার প্রস্তাব ছিল তারা একটি ক্রিপটো লাইব্রেরি বানাবেন এবং সেটার লাইসেন্স বিক্রি করবেন। কোম্পানির নাম দেওয়া হয় ফিল্ড লিংক। কিন্তু কাজ শুরু করার পর টের পাওয়া গেল এই প্রোডাক্টের তেমন কোনো চাহিদা নেই। অচিরেই হবে এমন আশ্বাসও নেই। পিটার থিয়েল তখন বললেন, টাকা রাখার কোনো বুদ্ধি করা যায় কি না। লেভচিন ক্রিপ্টোগ্রাফি দিয়ে নিরাপদ একটা আইওইউ তৈরি করতে সক্ষম হলেন। কোম্পানির নাম দেওয়া হলো ইনফিনিটি ইন কনফিডেন্স বা কনফিনিটি। দুটি পামটপ ডিভাইসে তাদের সফটওয়্যার থাকবে এবং দুটির ইনফ্রারেড পোর্ট ব্যবহার করে টাকা আদান-প্রদান করা যাবে। লেভচিনের ধারণা হলো, যেহেতু এর মাধ্যমে নিরাপদে টাকা স্থানান্তর করা যাবে, কাজে এটি খুব পপুলার হবে। কিন্তু সেটা হলো না। কারণ, জটিল এই পদ্ধতিতে টাকা বিনিময়ের জন্য দুজনকে কাছাকাছি আসতে হয়। তাহলে তোলোকে টাকায় আদান-প্রদান করতে পারে! এই সময়ে কেউ একজন লেভচিনকে পরামর্শ দিলেন পামটপের ব্যাপারটা বাদ দেওয়া যায় কি না। লেভচিন দেখলেন সেটি সম্ভব। পামটপের পরিবর্তে লোকের ই-মেইল ঠিকানার সঙ্গে তার এই জটিল পদ্ধতি জুড়ে দেওয়া যায়। তখন দুজন ব্যক্তির ই-মেইল থাকলেই তারা টাকা বিনিময় করতে পারবেন। তখন তারা তাদের কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে রাখেন পেপাল। এখানে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড থেকে পেপাল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে পারবেন। তারপর ওই অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য পেপাল অ্যাকাউন্টে টাকা আদান-প্রদান করা যায়।

চিত্র ২: পেপালের লোগো

লোকে তা-ও খুব একটা ব্যবহার করেন না। তখন আসলেন লুক নোসেক। বললেন, আমরা তাহলে নতুন অ্যাকাউন্ট খুললে তাকে ১০ ডলার দিই। আর কেউ যদি কারও রেফারেন্সে অ্যাকাউন্ট খোলেন, তাহলে যে রেফার করবেন তাকেও ১০ ডলার। এই ঘোষণার পর অনেকেই পেপালে অ্যাকাউন্ট খুলতে শুরু করলেন। যারা নিজেদের মধ্যে টাকা আদান-প্রদান করলেন, তারা দেখলেন এটা খুবই ভালো। তাদের কেউ কেউ ই-বেতে বেচাবিক্রির সময় পেপালে টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে শুরু করলেন। ই-বে হচ্ছে একটি অনলাইন। নিলামের দোকান। এখানে আপনি কেনার পর বিক্রেতাকে টাকা পরিশোধ করাটা একটা ঝামেলা। প্রথমত, আপনি যদি ক্রেতা হন, তাহলে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে থাকেন। আবার চেক পাঠালে সেটা সেলারের অ্যাকাউন্টে ক্যাশ হতেই ১০ দিন পর্যন্ত লেগে যায়, ডাক বিভাগের সময়সহ। কাজে ই-বের ব্যবহারকারীরা একটা সহজ সমাধান খুঁজছিলেন যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা অনলাইনে সহজে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। পেপাল তাদের এই সুযোগ করে দিল। ই-বের ব্যবহারকারীরা যখন পেপালকে তাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেছে, তখনো পেপালের কোনো লোগো ছিল না!

অনলাইনে টাকাকড়ি লেনদেনের এই সময় আরও কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যার মধ্যে এলন মাস্কের এক্সডটকম বেশ এগিয়ে। এলন। পেপালের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। যেমন এক্সডটকমে অ্যাকাউন্ট খুললেই ২০ ডলার ফাউ। অচিরে পেপাল আর এক্সডটকম দেখল, নিজেরা নিজেরা লড়াই করলে তারা দুজনই পথে বসে পড়বে এবং কোনো তৃতীয় পক্ষ সেই জায়গা দখল করে ফেলবে। কাজেই এলন। মাস্ক ও পিটার থিয়েল বসে একদিন ঠিক করলেন এক্সডটকম ও পেপাল এক হয়ে যাবে। মার্চ ২০০০ সালে দুই কোম্পানি পেপাল নামে একত্র হয়ে গেল।

এ সময় পেপালই শুধু অনলাইন টাকার পেছনে ছোটেনি। অন্যগুলোর মধ্যে ডটব্যাংক, পেমি ও এক্সডটকম ছিল উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে এক্সডটকমের উদ্যোক্তা এলন মাস্ক। ই-বের লোকেদের মধ্যে পেপালের জনপ্রিয়তা এবং ১০ ডলার ফাউ দেওয়ার বিষয় থেকে মাস্ক

এক্সডটকম আরও বেশি সুযোগ দিতে শুরু করে। যেমন এক্সডটকমে অ্যাকাউন্ট খুললেই তাদের ওয়ালেটে ২০ ডলার দেওয়া। এ ছাড়া পেপাল কোনো নতুন ফিচার চালু করলেই সেটা কপি করতে শুরু করেন। ফলে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লড়াই জমে ওঠে। অচিরেই পেপাল এবং এক্সডটকমের হাতের টাকা ফুরিয়ে যায় এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো বাড়তে থাকে। পিটার থিয়েল হিসাব করলেন যে প্রতিষ্ঠান আগে আইপিওতে যেতে পারবে, তারাই এ লড়াইয়ে জিতবে। কিন্তু ম্যাক্স লেভচিন ভাবলেন, এভাবে লড়াই করলে পেপাল এবং এক্সডটকম দুই পক্ষই একদিন দেউলিয়া হয়ে যাবে। তখন তৃতীয় পক্ষ এসে বাজার দখল করে ফেলবে। কাজেই ম্যাক্স ও থিয়েল একদিন মিটিং করলেন এলন মাস্কের সঙ্গে এবং তারা একমত হলেন, 'প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতায়। শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালের মার্চে উভয় প্রতিষ্ঠান একীভূত হলো। বিল হ্যারিস হলেন সিইও, এলন মাস্ক চেয়ারম্যান ও পিটার থিয়েল শীর্ষ আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও)।

কিন্তু দুই কোম্পানির কালচার দুই রকম। এক্সডটকম কাজ করত প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির মতো। কিন্তু পেপালে ছিল স্বাধীন কাজের পরিবেশ। ফলে অচিরেই দুই কোম্পানির মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। হ্যারিসের সঙ্গে পিটার থিয়েলের ঝগড়ার একপর্যায়ে পিটার কোম্পানি ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু এতে কোনো উন্নতি তোহলোই না বরং অবস্থার ক্রমাবনতি হতে থাকল। বাধ্য হয়ে এলন মাস্ক জরুরি বোর্ড সভা ডেকে হ্যারিসকে বরখাস্ত করে নিজেই প্রধান নির্বাহী হলেন আর পিটার থিয়েলকে ফিরিয়ে আনলেন চেয়ারম্যান হিসেবে। থিয়েল ফেরার পর কোম্পানি গোছানোর কাজ শুরু হলো। শুধু স্টার্টআপ নয়, যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে এর কর্মীদের ওপর। কাজেই তারা নজর দিলেন কর্মী সংগ্রহে। থিয়েল, মাস্ক ও লেভচিন একদিন বসে একটা তালিকা করলেন। প্রত্যেকে ২০ জনের তালিকা। চেনা-পরিচিতদের মধ্যে স্মার্টেস্ট, উদ্যমী, কাজে আগ্রহী ও হাসিখুশি। তারপর তাদের প্রস্তাব দিতে শুরু করেন।

১. কাউকে কাউকে সরাসরি বলতেন আমাদের সঙ্গে আসো।

২. কাউকে কাউকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলতেন— আমরা পেপাল নামে একটা সিস্টেম বানিয়েছি। এ রকম এ রকম করছি। আমাদের কিছু লোক দরকার।

৩. কাউকে কাউকে চ্যালেঞ্জের কথা বলতেন। এটা ছিল সবচেয়ে ডিফিকাল্টদের আনার ব্যাপারে। এ রকম ব্যক্তিদের টার্গেট করে প্রতি সপ্তাহে দেখা করতেন। আর নতুন এক্সাইটিং কী হচ্ছে সেটা বলতেন। দেখা যেত শেষমেশ ওই লোক উৎসাহী হতেন।।

এভাবে তাদের টার্গেটের ৬০ জনের মধ্যে ৬ জন বাদে সবাইকে তারা টিমে আনতে সক্ষম হন। এসব যখন চলছে, তখন এলন মাস্ক বসে বসে প্ল্যান করছেন, কীভাবে পেপালের পরিবর্তে এক্সডটকমকে জনপ্রিয় করা যায়। যদিও সার্ভে থেকে বোঝা যাচ্ছিল এক্সডটকমের প্রতি মানুষের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। এই সময় লেভচিন একদিন। বিদ্রোহ করে বসেন। টেকনিক্যাল টিমের লোকজনকে নিয়ে বোর্ডের কাছে হাজির। দাবি সোজা- মাস্ককে অপসারণ করতে হবে, নতুবা দলবল নিয়ে তিনি চলে যাবেন। তাদের কু সফল হয় এবং বোর্ড মাস্ককে অপসারণ করে থিয়েলকে অন্তর্বর্তীকালীন সিইও বানায়। এই সময় মাস্ক ছুটিতে ছিলেন। কিন্তু ছুটি থেকে ফিরে মাস্ক আর কোনো ঝামেলা না করে টেসলা তৈরিতে বের হয়ে পড়েন।

যখন পেপালের গ্রাহক সংখ্যা ২০ কোটি হলো, তখন উদ্যোক্তারা ঠিক করলেন এখন বিক্রি করা যায়। তারা গুগল ও ইয়াহুকে বললেন, ৬০০ মিলিয়ন ডলারে পেপাল কিনে নিতে। কিন্তু ইয়াহু বা গুগল এই বলে রাজি হলো না যে, পেপাল একটা ই-বে জিনিস। এ কথা শুনে পেপালের লোকেরা তাদের প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। এই সময় ই-বে ৮৫০ মিলিয়ন ডলারে পেপাল কেনার প্রস্তাব দিলে থিয়েলের নেতৃত্বে সেটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাদের এইপিওতে ভ্যালু হয় ১.২ বিলিয়ন ডলার। বাধ্য হয়ে ই-বে ২০০২ সালে পেপালকে কিনে নেয় ১.৫ বিলিয়ন ডলারে। টাকা পেয়ে পেপালের বেশির ভাগ উদ্যোক্তা ও কর্মী ই-বে থেকে বের হয়ে নিজেরাই টেসলা, লিংকডইনের মতো নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন

বা ফেসবুকের মতোপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেন। এই দলটিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইউটিউবের সহপ্রতিষ্ঠাতা জাওয়েদ করিমও রয়েছেন। ফরচুন ম্যাগাজিনের পর থেকে পেপাল মাফিয়া শব্দটি তাদের সবার জন্য প্রযোজ্য হয়ে যায়।

বর্তমানে ১৯০টি দেশে প্রায় ৩৬ কোটির বেশি ব্যবহারকারী পেপাল ব্যবহার করেন। পেপালের এখন বাজার তহবিল হলো ২৭৫ বিলিয়ন। ডলার!
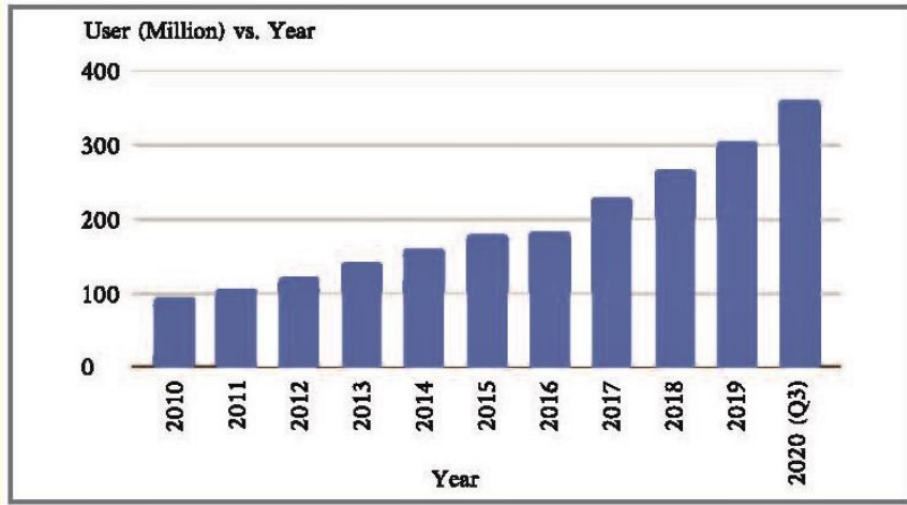
চিত্র ৩: পেপালের গ্রাহক সংখ্যা, ২০১০-২০২০-এর তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত

পেপালের সাফল্যের কারণগুলো আমরা একটু খতিয়ে দেখতে পারি—

১. প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট: লেভচিন বা থিয়েল কেউ কিন্তু নিজেদের আইডিয়াতে গোঁ ধরে থাকেননি। যখনই টের পেয়েছেন যে তাদের চিন্তা বা প্রোডাক্ট বাজারের উপযোগী নয়, তখনই সেটাকে পরিবর্তন। করেছেন। এই পরিবর্তনের সময় সম্পূর্ণ নতুন কিছু না ভেবে নিজেদের শক্তিমত্তাকেই কাজে লাগিয়েছেন। পামটপ থেকে ই-মেইলে স্থানান্তরের সময় ক্রিপটোগ্রাফি ও নিরাপত্তার ব্যাপারটাকে সামনে রেখেছেন। কারণ, সেটাতে লেভচিনের সবচেয়ে বেশি দখল।

২. অনলাইন কেনাকাটার সমাধান: সে সময় অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে টাকাপয়সা লেনদেনের কোনো ভালো সিস্টেম ছিল না। পিটার থিয়েল মনে করতেন, অনলাইন লেনদেনেই পরবর্তী জায়ান্টের

আবির্ভাব হবে। সে জন্য তিনি লেভচিনকে ‘নিরাপদ টাকা স্থানান্তর নিয়ে ভাবতে বলেন।

৩. প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ: একটা ভালো প্রোডাক্টের পেছনেই তাদের দৌড়ঝাঁপ ছিল সবচেয়ে বেশি। ফলে এমনকি একটা লোগো বানানোর কথাও তাদের মাথায় আসেনি। শুধু কনফিনিটি থেকে পেপাল নামে পরিবর্তন করা হয়েছে। ই-বের লোকেরা যখন নিজেরা এটা প্রমোট করতে চেয়েছেন, তখনই কেবল লোগো তৈরি হয়েছে।

৪. দক্ষ কর্মীর সমাহার: পেপালের কর্মী বাহিনী এখনো পৃথিবীর যেকোনো স্টার্টআপের জন্য ঈর্ষণীয়। এই নিবন্ধের শুরুতে সেটা আছে। এই কর্মী বাহিনী জোগাড় করা এবং তাদের জন্য একটি চমৎকার কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা ছিল পেপালের একটা বড় সাফল্য।

৫. গ্রোথ হ্যাকিং মার্কেটিং: পেপাল তাদের গ্রাহকদের সাইনআপের জন্য ১০ ডলার দিতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, রেফারেল সিস্টেমও চালু করে। ফলে রেফারেলের কারণে দ্রুত কিছু ব্যবহারকারী পেয়ে যায়।

৬. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট: শুরু থেকে পেপাল নিজেদের ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি কমিউনিটি গড়ে তোলেন। শুরুতে রেফারেলের মাধ্যমে এবং পরে কাস্টমার সার্ভিসের মাধ্যমে পেপাল তার কমিউনিটির সাপোর্টে দাঁড়ায়। ই-বে যখন পেপাল কিনতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা বিলপয়েন্ট নামের আর একটি লেনদেন প্ল্যাটফর্মকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করে। ই-বেতে সেটিকে বাধ্যতামূলক করারও চেষ্টা করে। কিন্তু ই-বের ব্যবহারকারীরা সেটি মেনে নেননি। বিভিন্ন ফোরামে (ই-বের মেইল, সাপোর্ট ইত্যাদিতে) তারা পেপালের পক্ষে তাদের মত দিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত ই-বেকে বাধ্য করে পেপালেল পক্ষে আসার জন্য।

৭. সঠিক সময়ে হস্তান্তর: পেপালের মূল উদ্যোক্তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের প্রোপার ভ্যালুয়েশন করতে পেরেছেন। ফলে ই-বের ১.৫

বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছেন। আইপিওর পর লোকের। চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনি কাজের ক্ষেত্র এবং কমপ্লায়েন্সের জন্য অনেক খাটাখাটুনির দরকার ছিল। এ জন্য টাকার দরকার ছিল। অন্য দিকে রুটিন নিরাপত্তাজনিত কাজ ছাড়া বড় কোনো উদ্ভাবনের সুযোগ সে সময় ছিল না বলেই মনে হয়েছে। কাজেই ঠিক সময়ে তারা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পেপাল মাফিয়ারা

মিডিয়ার বরাত অনুযায়ী পেপালের সদস্য যারা—

পিটার থিয়েল: পেপালের প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি কখনো কখনো পেপাল মাফিয়ার 'ডন' হিসেবে উল্লিখিত হয়ে থাকেন।

ম্যাক্স লেভচিন: প্রতিষ্ঠাতা এবং চিফ টেকনোলজি অফিসার। তবে কখনো কখনো তাকে পেপাল মাফিয়ার চালক বলা হয়।

এলন মাস্ক: এক্সডটকম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে 'কনফিনিটি' কোম্পানির সঙ্গে একীভূত হয়, পরে পেপালে রূপ নেয়। তারপর ইলন মাস্ক টেসলার সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দায়িত্ব নেন। এ ছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠা করেন স্পেস এক্স, নিউরালিংক, ওপেন এআই, ডি বরিং কোম্পানি এবং সোলার সিটির চেয়ারম্যান হন পরবর্তী সময়ে।

ডেভিড ও স্যাক: পেপালের সাবেক সহপ্রতিষ্ঠাতা। যিনি পরবর্তী সময়ে গেনিডটকম ও ইয়াম্মা প্রতিষ্ঠা করেন। স্কট বানিস্টার: আইরনপোর্টের সাবেক প্রধান প্রযুক্তি নির্বাহী এবং পেপালের বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রোয়েলফ বোথা: সাবেক পেপালপ্রধান ফিনান্সিয়াল নির্বাহী, তবে তিনি পরবর্তী সময়ে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম 'সেকুইয়া ক্যাপিটাল'এর অংশীদার হয়েছিলেন।

স্টিভ চ্যান: সাবেক পেপাল প্রকৌশলী এবং ইউটিউবের সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ছিলেন।

ডেভিড গাউসবিক: সাবেক পেপাল টেকনিক্যাল আর্কিটেকট, সহনির্মাতা গাউসবিক— লেভচিন টেস্ট কোম্পানি এবং ম্যাটারপোর্ট ইঙ্কর (একটি ডিজিটাল থ্রিডি ডিজিটাল কোম্পানি) সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

রেফিড হফম্যান: সাবেক নির্বাহী সহসভাপতি, যিনি পরবর্তী সময়ে লিংকডইন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি ফেসবুক, আভিয়ারাই, ফ্রেন্ডসটার, সিক্স, অ্যাপার্ট, যিয়ঙ্গা, আইরনপোর্ট, ফ্লিকার, ডিগ, গ্রোকিট, পিংডটফেম, ন্যানোসোলার, কেয়ারডটকম, নেউটোন, কোনোগ্রিগ্যাট, লাস্টডটএফেম, নিং এবং টেকনোরাতির মতোপ্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারী।

ক্যান হোয়েরি: সাবেক পেপালপ্রধান ফিনান্সিয়াল নির্বাহী, যিনি পরবর্তী সময়ে ফাউন্ডারস ফান্ডের অংশীদার হন।

চ্যাড হারলি: সাবেক পেপাল ওয়েব ডিজাইনার, যিনি ইউটিউবের সহপ্রতিষ্ঠাতাও বটে।

ইরিক এম জ্যাকসন: দ্য পেপাল ওয়ার্স বইটির রচয়িতা এবং পরবর্তী সময়ে প্রধান নির্বাহী হিসেবে ‘ডব্লিউ এন দ্য বুকস’-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ক্যাপলিংকডের সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

জাওয়াদ করিম: সাবেক পেপাল প্রকৌশলী এবং ইউটিউবের সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইউটিউবের প্রথম ভিডিও ‘মি এট দ্য যু’ আপলোড করেন ২৩ এপ্রিল ২০০৫ সালে।

যারেড কফ: সাবেক পেপাল কর্মকর্তা এবং পিটার থিয়েলের সহকারী হিসেবে ছিলেন। তিনি স্লাইড, হোমরান এবং নেক্সটরোলের। সহপ্রতিষ্ঠাতা।

জো লন্সদেল: পালান্তির, অ্যাডেপার ও ওপেনগভের সহপ্রতিষ্ঠাতা। এইট ভি সি ও ফর্মেশন এইটের প্রতিষ্ঠাকালীন সহযোগী হিসেবে। ছিলেন।

ডেভ মেকক্লার: পেপালের সাবেক মার্কেটিং ডিরেক্টর এবং তাকে স্টার্টআপ কোম্পানির জন্য ‘সুপার অ্যাঞ্জেল বিনিয়োগকারী হিসেবে

আখ্যায়িত করা হয়। তিনি প্রায় ৫০০ স্টার্টআপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন।

এন্ডরিউ ম্যাক করমেক: ভালার ভেঞ্চারের (venture) সহপ্রতিষ্ঠাতা।

লুক নোসেক: পেপালের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কেটিং অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি বিভাগের সাবেক সহকারী সভাপতি হিসেবে ছিলেন। তিনি পিটার থিয়েল ও ক্যান হোয়েরির সঙ্গে ফাউন্ডারস ফান্ডের অংশীদার হন।

জেসন পোর্টোনি: সাবেক সহকারী সভাপতি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরবর্তী সময়ে প্রধান ফিনান্সিয়াল নির্বাহী হয়ে যান। ক্লারিয়াম ক্যাপিটালের, যা থিয়েলের প্রতিষ্ঠান।

কেইথ রাবিয়স: পেপালের সাবেক নির্বাহী এবং পরবর্তী সময়ে তিনি লিংকডইন, স্লাইড, স্কয়ার, খোসলা ভেঞ্চারে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি পিটার থিয়েলের সঙ্গে ফাউন্ডারস ফান্ডে কর্মরত। তিনি ব্যক্তিগতভাবে টোকবক্স, জুম, স্লাইড, লিংকডইন, জেনি, রুম নাইন এন্টারটেইনমেন্টে বিনিয়োগ করেন।

জ্যাক শেলবি: পেপালের 'করপোরেট এবং আন্তর্জাতিক ডেভেলপমেন্টের সাবেক সহসভাপতি। তিনি ক্লারিয়াম ক্যাপিটালের সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের পরিচালক হয়ে যান।

প্রিমল শাহ: পেপালের সাবেক প্রোডাক্ট ম্যানেজার এবং পরবর্তী সময়ে কিভাডটঅরগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি হন।

রাসেল সিম্মন্স: পেপালের সাবেক প্রকৌশলী, সহকারী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইয়েল্প ইঙ্কের।

জেরেমি স্টোপেলম্যান: পেপালের প্রযুক্তি বিভাগের সহসভাপতি এবং ইয়েল্প ইঙ্কের সহপ্রতিষ্ঠাতা।

ইয়েশান অং: পেপালের সাবেক প্রকৌশলী পরিচালক, যিনি পরবর্তী সময়ে ফেসবুকে কাজ করেন এবং সবশেষ রেডিটের প্রধান নির্বাহী হয়ে যান।

সম্পর্ক ঝালিয়ে বিলিওনিয়ার

২০০3 সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্ক জাকারবার্গ হার্ভার্ডের কাকল্যান্ড হাউসের বাসিন্দা হতে আসে। এইচ ৩৩ রুমটি ভবনের চারতলায়। মার্কের সঙ্গে ছিল একটি আট ফুট দৈর্ঘ্যের হোয়াইট বোর্ড। যেকোনো চিন্তাভাবনা করার সময় এ বোর্ডটি তার সহায়! তার বিক্ষিপ্ত চিন্তা এই বোর্ডকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীভূত হয়।

হাউসের স্যুটটি একটু জটিল। দরজা পেরোলে একটি কমন রুম। চারটি পড়ালেখার ডেস্ক রয়েছে সেখানে। কমনরুম পার হয়ে দুটি বেডরুমে যাওয়া যায়। যে যাওয়ার পথে মাত্র একটি দেয়ালই খালি।। সেখানে সানন্দে বসে গেল হোয়াইট বোর্ডটি।

শোবাররুম দুটি একই রকম। একটি দোতলা খাট। দুটি ডেস্ক আর ক্যাবিনেট। এর একটিতে মার্কের সঙ্গে থাকবে হিউজেস। সাহিত্য আর ইতিহাসে মেজর। দুজনের কেউ রাজি হলেন না ওপরে থাকতে। কাজেই খাট খুলে রুমের মধ্যে পেতে ফেলা হলো। ফলাফল হলো এ রুমে আর নড়াচড়া করার কোনো জায়গাই থাকল না। পাশের রুমে ডাসটিন মস্কোভিচ, অর্থনীতির ছাত্র আর বিলি ওলসন। চারের মধ্যে মার্কই কেবল কম্পিউটারে মেজর। সারা দিন ধরে খালি কোড করার চিন্তা আর নানান প্রজেক্ট, আর ইন্টারনেট।

মার্কের ধ্যানজ্ঞান হলো ইন্টারনেট।

বাকিদের মধ্যে কম্পিউটার নিয়ে কিছুটা আগ্রহ আছে মস্কোভিচের।

সাইক্রিয়াটিস্ট মার মতে মার্ক প্রচণ্ড অগোছালো হওয়ার কারণ হলো। ছোটবেলা থেকে তার ন্যানি ছিল। ফলে নিজে থেকে কিছু করে না। কোক বা বিয়ার খাওয়ার পর ক্যানটি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার কথা মার্ক ভাবে না। সে সেটি যেকোনো স্থানে রাখে এবং তারপর সেটির কথা ভুলে যায়। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে এইচ ৩৩-এর অবস্থা হলো দেখার মতো। মাঝেমধ্যে মস্কোভিচের বান্ধবী প্রচণ্ড রেগে তাদের রুম পরিষ্কার করে দিয়ে যান!

মাসখানেকের মধ্যে মার্ক তার প্রথম প্রজেক্টে হাত দেন। প্রজেক্টটি খুব সহজ। টপোলজি ক্লাসে আমার পাশে যদি কোনো সুন্দরী মেয়ে বসে, তাহলে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে পরের সেমিস্টারে সে কোন কোন সাবজেক্ট নেবে। তাহলে আমিও সে কোর্স রেজিস্টার করতে পারি।

মার্কের প্রথম প্রজেক্ট, কোর্স ম্যাচ ঠিক এই কাজটা করেছে। কোন শিক্ষার্থী কোন কোর্স রেজিস্টার করেছেন, যেমন জানা যায় তেমনি কোন কোর্সে কে কে আছে, সেটাও যায়। জানা কথা, প্রজেক্টটি দারুণভাবে সফল হবে।

মার্ক তার পরের প্রজেক্টটির প্রেরণা পান সম্পূর্ণ অন্য জায়গা থেকে। টি-শার্ট পরা কিছুটা অন্তর্মুখী, অথচ মুখের কাছে সব সময় হাসি ধরে রাখা মার্ক কিন্তু মেয়েমহলে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু সব কাল তোআর এক যায় না?

কাজে তাকেও কারও না কারও কাছে হারতে হয়। এ রকম একবার তার মনে হলো, এমন একটা সফটওয়্যার বানাতে হবে, যা কি না নির্দিষ্ট কোনো লোককে কোনো জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করে রেটিং দেবে। যে বেশি রেটিং সে পরের ধাপে যাবে, আরও হট কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে। বিল প্রথম থেকে বলল জন্তুজানোয়ার আমদানির দরকার কী? বরং দুজন মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা হোক। সবাই র্যাঙ্কিং করুক। কিন্তু কলেজের সবার ছবি কোথায় পাওয়া যায়?

মার্কের মনে পড়ল প্রথম দিন, অরিয়েন্টেশনের সময় হাউসের ক্যামেরাম্যান সবার ছবি তোলে। সেগুলো রাখা হয় হাউসের ফেসবুকে। মার্ক শুরু করলেন সেগুলোর ডিজিটাল কপি সংগ্রহ। নিজের হাউস তো হলো? বাকিগুলো।

হার্ভার্ডের ১২টি হাউসের ৯টির ফেসবুকের সব ফেসের ছবি জোগাড় করা হলো ২ পদ্ধতিতে হ্যাকিং আর অন্যদের পাসওয়ার্ড জোগাড় করে।

তো শুরু হলো ফেসম্যাশ, একটি ওয়েবসাইট, যার হোমপেজে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা হলো, কে হট সেটা বের করতে। মার্কের ল্যাপটপে সিস্টেম রেডি হলো ২ নভেম্বর বিকেলে। "টেস্ট করা আর সাজেশন দেওয়ার জন্য মার্ক তার কয়েকজন বন্ধুকে মেইল করে। জানালেন। এই টেস্টাররা তাদের বন্ধুদের জানিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয়ে গেল 'আন্ডারগ্রাউন্ড হিট। মার্কের রুমের পাশের ঘরের একটি ছেলে প্রথম ঘণ্টার মধ্যে শীর্ষ স্থানে চলে আসলেন। কাজে সে তাড়াতাড়ি তার বন্ধুদের জানালেন। রাত ১০টায় মার্ক যখন তার রুমে ফিরে আসলেন, তখন তোল্যাপটপের অবস্থা কাহিল। কারণ, ব্যাপক হিট হচ্ছে।

সবকিছু ভালো হয় না। মেয়েদের মহলে ব্যাপারটি জানাজানি হতে বেশি দেরি হলো না। দুটি সংগঠন দ্রুত এই সাইটের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ উত্থাপন করল। টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের। রাত ১০টা ৩০ মিনিটে মার্কের ল্যাপটপের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলো নেটওয়ার্ক থেকে।

ততক্ষণে ৪৫০ শিক্ষার্থী ২২ হাজার জোড়া ছবির তুলনা করে ফেলেছেন!

ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে যেতে হলো মার্ককে। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ।

কিন্তু কোর্সম্যাচ আর ফেসম্যাশ দিয়ে ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে ভবিষ্যতের দুনিয়া কাঁপানোর ভিত।

দ্য ফেসবুক

ফেসম্যাশে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির নয়টি হাউসের শিক্ষার্থীদের ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে সে সময় সব হাউস মিলে একটি সর্বজনীন ফেসবুক ছিল না। হার্ভার্ডে নিজস্ব নিউজলেটারে এই সময় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে ফেসম্যাশের প্রশংসা করে বলা হয় যে একটি সর্বজনীন ওয়েবসাইট, যেখানে শিক্ষার্থীদের নানা কিছু থাকবে, সেটা সময়ের দাবি। মার্ক জাকারবার্গ ভাবলেন, সেটা বানানো যাক। ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তিনি এমন একটি সাইটের কাজ শুরু করেন। ডোমেইন হিসেবে নিবন্ধন করেন। thefacebook.com। এই সময় তার পরিচয় হয় হার্ভার্ডের আর একজন ছাত্র এডুয়ার্ডো স্যাভেরিনের সাথে। তারা দুজনে প্রত্যেকে। এক হাজার ডলার করে এই সাইটে বিনিয়োগ করতে রাজি হন। ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি দ্য ফেসবুক আত্মপ্রকাশ করে।

সাইট তৈরির পর জাকারবার্গ তার কয়েকজন বন্ধুকে ব্যাপারটা জানান। রুমমেট ডাস্টিন মস্কোভিচ তাকে পরামর্শ দেন, এ খবরটা যেন কাকল্যান্ড হাউসের অনলাইন মেইলিং লিস্টে দেওয়া হয়। সেখানে ৩০০ জন মেম্বার আছেন। মস্কোভিচের কথানুসারে সেদিন রাতের মধ্যে প্রায় ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী নিবন্ধন করে ফেলেন।

চিত্র ৪: যুবক মার্ক জাকারবার্গ তার রুমে কোড করছেন।

ঘটনা ঘটতে শুরু করে এরপর। মাত্র ছয় দিন পরে মার্কদের সিনিয়র। তিন ছাত্র ক্যামেরন উইঙ্কেলভস ও তার ভাই টেইলর উইঙ্কেলভস এবং দিব্য নরেন্দ্র, মার্ক জাকারবার্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্য ছিল, তারা মার্ককে হায়ার করেছেন হার্ভার্ড কানেকশন। নামের একটা সামাজিক যোগাযোগ সাইট বানিয়ে দেওয়ার জন্য। তারা জানতেন, তিনি তাদের সাইট বানাচ্ছেন। কিন্তু আসলে তিনি নিজেই একটা সাইট বানিয়েছেন। কিন্তু দ্য ফেসবুকের ধারণা আসলে তাদের। ক্রিমসন পত্রিকায় অভিযোগ করলে তারা তদন্ত শুরু করে। তদন্ত যাই হোক না কেন ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হয়ে যায় তিনজনকে কিছু শেয়ার দেওয়ার মাধ্যমে।

শুরুতে শুধু হার্ভার্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি সীমিত থাকে। কিন্তু প্রথম মাসের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই এখানে নিবন্ধন করে ফেলেন। জাকারবার্গ তখন দল ভারী করেন। যুক্ত হয় ডাস্টিন মস্কোভিচ, এনডু ম্যাককলাম ও ক্রিস হিউজেস।

মার্চ, ২০০৪ সালে স্যানফোর্ড আর ইয়েলের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং ক্রমান্বয়ে আইভিলিগের কলেজগুলোর জন্য ফেসবুক ছেড়ে দেওয়া হয়। জুন মাসে কোম্পানি নিবন্ধন করা হয়। জাকারবার্গের অ্যাডভাইজর সিন পার্কার প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগ দেন। নিবন্ধনের চাপের সঙ্গে সঙ্গে কাজ বেড়ে যাওয়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার পলো অল্টোতে সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সিন পাকার ফেসবুকের জন্য বিনিয়োগ খুজতে বের হন। তিনি অ্যাপ্রোচ করেন লিংকডইনের সিইও রিড হফম্যানকে। কিন্তু লিংকডইনও যেহেতু একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তাই রিড সরাসরি বিনিয়োগে রাজি হলেন না। বরং তিনি সিন পার্কারকে বললেন, পিটার থিয়েলকে অ্যাপ্রোচ করতে। পিটার ও হফম্যান দুজন। পেপালে একত্রে কাজ করতেন এবং তারা পরবর্তী সময়ে পেপাল মাফিয়ার অন্যতম সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। মার্কের সঙ্গে পিটারের কয়েক দফা মিটিংয়ের পর পিটার ১০.২% শেয়ারের বিপরীতে ৫ লাখ ডলারের বিনিয়োগ করেন। এর মধ্যে সার্ভারের খরচ তোলার

জন্য মার্ক সাইটে বিজ্ঞাপন নেওয়াও শুরু করেছেন। তারপর দুই লাখ ডলারে facebook.com কিনে নিয়ে নাম থেকে The বাদ দেওয়া হয়। প্রতিনিয়ত তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে ডেটাসেন্টারের খরচ।

২০০৫ সালের শুরু থেকে আবার বিনিয়োগের চেষ্টা শুরু হয়। সিরিজ এ-এর বিনিয়োগকারী হিসেবে আসে এসেল পার্টনার। ৯৮ মিলিয়ন ডলারের ভ্যালুয়েশনে তারা ১২.৭ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেন। ডিসেম্বর নাগাদ ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা হয় ৬ মিলিয়ন।

এর মধ্যে প্রথমে যুক্তরাজ্য এবং পরে অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুককে উন্মোচিত করা হয়। উন্মোচিত করা হয় অ্যাপল ও মাইক্রোসফটের কর্মীদের জন্য। শেষ পর্যন্ত ২০০৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ১৩ বছরের বেশি বয়সী পৃথিবীবাসীর জন্য ফেসবুক উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। শর্ত একটাই— একটি ই-মেইল থাকতে হবে। বছর না ঘুরতে কোম্পানির ভ্যালুয়েশন পাঁচ গুণ বেড়ে হয় ৫০০ মিলিয়ন ডলার। সিরিজ বি থেকে ফেসবুক জোগাড় করে ২৭.৫ মিলিয়ন ডলার।

এর মধ্যে ব্যক্তিগত প্রোফাইলের পাশাপাশি কোম্পানিও ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলতে শুরু করে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে এ রকম পেজের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যায়।

ইয়াহুর কাছে বিক্রি?

২০০৫ সালের জুলাই মাসের ১৯ তারিখে ফেসবুকের প্রতিদ্বন্দ্বী মাইস্পেসকে কিনে নিয়ে মিডিয়া মোগল নিউজ কর্প। বোঝা যায়, তারা অনেক বিনিয়োগ করবে। সঙ্গে সঙ্গে সিলিকন ভ্যালিতে গুঞ্জন উঠল, ফেসবুক বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কিনে নিচ্ছে কেউ না কেউ। ২০০৬ সালের ২৮ মার্চ বিজনেস উইকে লেখা হয়, ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন মার্ক জাকারবার্গ। এরপরই বাজারে আসে ইয়াহুর নাম। বলা হয় ইয়াহু ফেসবুককে কিনতে চেয়েছে। এক বিলিয়ন ডলারে। কিন্তু তাতেও রাজি হয়নি ফেসবুক। এ সময় অন্যতম বোর্ড মেম্বার পিটার থিয়েল জানান, তাদের অভ্যন্তরীণ

হিসেবে ফেসবুকের ভ্যালুয়েশন ৮ বিলিয়ন ডলার। কারণ, ২০১৫ সালে তাদের আয় হবে ১ বিলিয়ন ডলার। যা হোক ইয়াহুর পরে মাইক্রোসফট ও গুগল ফেসবুকের শেয়ার কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ সময় মার্ক জাকারবার্গ এক বিবৃতিতে নিশ্চয়তা দেন যে তারা ফেসবুক বিক্রি করছেন না এবং এই মুহূর্তে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবনা আইপিওতেও যাচ্ছেন না। তবে অক্টোবর, ২০০৭-এ মাইক্রোসফটের কাছ থেকে ২৪০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ নেয় ফেসবুক। বিনিময়ে ১.৬% শেয়ার দিতে রাজি হয়। নভেম্বর মাসে হংকংয়ের ধনকুবের লি । কা-সিং ফেসবুকে ৬০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেন।

লাভের মুখ

বিভিন্ন বিনিয়োগ ও কর্মীদের স্টক অপশনের বদৌলতে ২০০৮ সালে ফেসবুকের ভ্যালুয়েশন দাঁড়ায় ৫ বিলিয়ন ডলারে। এই সময়ে মার্ক এক সাক্ষাৎকারে জানান, সার্চ ইঞ্জিনের মতোবিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের হবে না। তাদের মডেল হবে ভিন্ন। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে ফেসবুক প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা হিসেবে শেরিল স্যান্ডবার্গকে নিয়ে আসে গুগল থেকে। সেরিলের দায়িত্ব হয় ফেসবুকের বিজ্ঞাপনের লং টার্ম কৌশল ঠিক করা। কর্মীদের সঙ্গে সিরিজ বৈঠক এবং হাতে গোনা বিজ্ঞাপন দাতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ফেসবুক তার লং টার্ম বিজ্ঞাপনের পলিসি ঠিক করে। শেরিলের নেতৃত্বে মূল সাইটেও নানা পরিবর্তন আনা হয়। ফলে বিজ্ঞাপন দাতাদের আগ্রহ বাড়ে। বিজ্ঞাপন আসতে শুরু করে। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমবারের মতো ক্যাশ ফ্লো ধনাত্মক হয়। মানে খরচের চেয়ে আয় বেশি হয়। এই ধারা দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। ২০১১ সালে বিজ্ঞাপন খাতে আয় ৯০% বেড়ে ৩.৭১ বিলিয়ন পৌছায়। এর ফলে প্রথমবারের মতোলাভের অঙ্ক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৫৬% বিজ্ঞাপনই আসে আমেরিকা থেকে। অন্যান্য দেশ থেকে বিজ্ঞাপন আসা শুরু হয়।

২০১০ সালে ফেসবুক তার ব্যবহারকারীদের বেটা টেস্টিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং পাজল প্রকাশ করতে শুরু

করে। এর ফলে অনেক মেধাবী প্রকৌশলী ফেসবুকে চাকরি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালের মধ্যে ফেসবুক হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় অনলাইন ফটো হোস্ট। ২০১১ সালের গ্রীষ্মে ফেসবুকে মানুষের ফটোর সংখ্যা ১০০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়।

২০১২ সালের ফেসবুক নিজেদের অ্যাপ সেন্টার চালু করে। সঙ্গে সঙ্গে একদল ডেভেলপার তার জন্য অ্যাপ বানানো শুরু করে। কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় ৫০০ গেমিং অ্যাপ সেখানে রিলিজ হয়। এই গেমগুলো ফেসবুকেই খেলতে হয়।
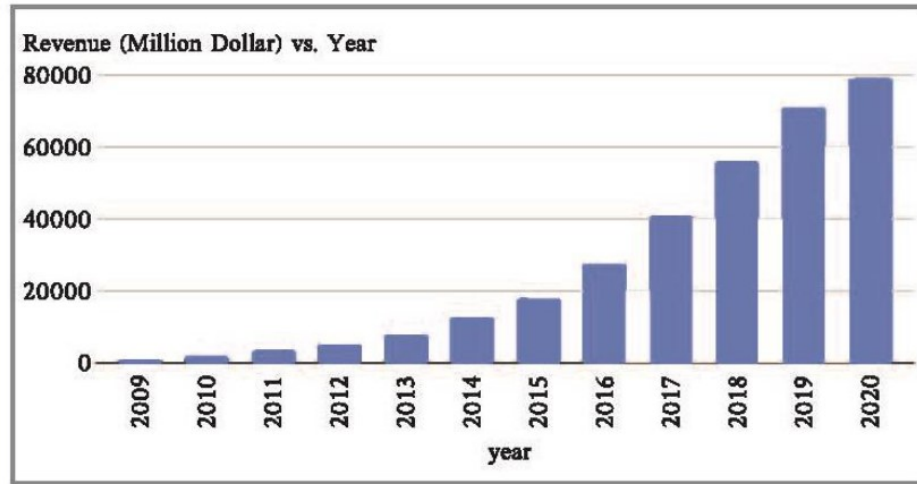
চিত্র ৫: ফেসবুকের বার্ষিক লাভের পরিমাণ (Statista)

আইপিও

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইপিওর জন্য আবেদন করে ফেসবুক। বলা হয়, তাদের ওয়েবসাইটে প্রতিদিন ২৭০ কোটি লাইক, কমেন্ট হয় এবং ৮৪৫ মিলিয়ন লোক মাসে সক্রিয় থাকে। ৫ বিলিয়ন ডলার তারা আইপিও থেকে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বন্ডারাইটাররা তাদের শেয়ারের দাম ঠিক করে প্রতিটি ৩৮ ডলার। ফলে কোম্পানির মূল্য দাঁড়ায় ১০৪ বিলিয়ন ডলারে, যা কিনা আমেরিকার ইতিহাসে তখন পর্যন্ত কোনো কোম্পানির প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের সর্বোচ্চ ভ্যালুয়েশন। আইপিও থেকে ফেসবুক ১৬ বিলিয়ন ডলার তুলে নেয়, যা আমেরিকার

ইতিহাসে তৃতীয় বৃহত্তম। আইপিও শেষে মার্কের শেয়ার দাঁড়ায় ২২% ও ভোটিং ক্ষমতা হয় ৫৭%। মার্ক ১৯ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ নিয়ে। বিলিওনিয়ারের খাতায় নাম লেখান।

কেন এই সাফল্য

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে ফেসবুকের সাফল্যের অনেক কারণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। এর মধ্যে শুরু থেকে যদি আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ করি, তাহলে এর জনপ্রিয়তার কারণগুলো ধরতে পারব। মনে রাখতে হবে, ফেসবুকের যখন আবির্ভাব, তখন প্রবল বিক্রমে মাঠে আসে মাইস্পেস। ২০০৪ সালের শেষে ফেসবুকের যখন এক মিলিয়ন ব্যবহারকারী হয়নি, তখন মাইস্পেসের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ মিলিয়নের বেশি। এ ছাড়া ২০০৫ সালেই নিউজ কর্প মাইস্পেসকে কিনে নিয়ে সেখানে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তারপরও কেন ফেসবুক?

সহজতা, সিমপ্লিসিটি: ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলাটা ছিল সহজ। মাইস্পেসে অ্যাকাউন্ট খোলার ঝক্কি অনেক। ফেসবুকের ইউজার ইন্টারফেসটাও সহজ। এত সহজ যে কোনো টিউটোরিয়ালের দরকার হচ্ছে না। এখানে খুব সহজে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাচ্ছে। মাই স্পেসে কেউ তার প্রোফাইল চেঞ্জ করতে চাইলে নিজেই প্রোগ্রাম করে সেটা করতে পারত। কিন্তু এ জন্য তার এইচটিএমএল জানা লাগত। ফলে দেখা যেত যারা এটি জানে, তাদের পেজগুলো অন্য রকম। সবাই আর একই সমতলে নেই।

প্রাইভেসি: মাইস্পেসেও প্রাইভেসির একটা ভালো দিক ছিল। সেখানে আপনি যে নেটওয়ার্কের সেখানেই থাকবেন। কিন্তু ফেসবুক প্রাইভেসির ব্যবস্থা এমন করেছে যে আপনার বিষয় আপনি ইচ্ছে করলে বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারবেন, আবার চাইলে আমজনতার জন্যও উন্মুক্ত করতে পারবেন। অনেক কলেজশিক্ষার্থী এটাতে অনেক উৎসাহ পেয়েছে; কারণ, তাতে নেটওয়ার্ক বড় করবার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

নিউজফিড: সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে ফেসবুক নিউজফিড উন্মোচিত করে (এখন ভাষ্য টাইমলাইন)। এটার বড় সুবিধা হলো একটি নির্দিষ্ট অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে নিউজফিডে আমার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সেখানে দেখা যায়। আমার বন্ধুদের নানা তথ্য আমি সেখানে পাই। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়। একবার গাটো দশেক বন্ধু মিলে একটা শোকসভাতে যাচ্ছে, যার খবর আমি জানি না। কিন্তু এ খবরটা যখন আমার সামনে এসে পড়ছে নিজে থেকে, তখন আমি এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে যাচ্ছি।

ডেভেলপার প্ল্যাটফর্ম: শুরু থেকে ফেসবুক ফেসবুককে কেন্দ্র করে অ্যাপ্লিকেশন বানাতে আগ্রহীদের জন্য একটি ডেভেলপার নেটওয়ার্ক তৈরি করে দিয়েছে। এর ফলে ডেভেলপাররাই অনেক কিছু বানাতে শুরু করেন, যা একা ফেসবুকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর ফলে ব্যবহারকারীরা প্রচুর বৈচিত্রের সন্ধান পেয়ে যায়। অন্যদিকে ডেভেলপার নেটওয়ার্ক থেকে ফেসবুক তার নিজের রিক্রুটমেন্টেরও একটা বুদ্ধি বের করে ফেলতে পারে।

বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য: ফেসবুকের বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্ক হলো বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ। ফেসবুক তাদের সুযোগ করে দিচ্ছে দুই ভাবে। একটি হলো এই প্ল্যাটফর্মে আপনি বিনা খরচে আপনার পেজ বানাতে পারবেন এবং অর্গানিক্যালি নিজের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবেন। আবার চাইলে আপনি আপনার উদ্দিষ্ট লোকের কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিতে পারছেন।

শেখার আছে অনেক কিছু

- **ঝুলিয়ে রাখলে চলবে না:** মার্ক ও তার বোর্ডের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া। উইংক্লোভাস ভাইদের বেলায় যেমন এই কাজটি মার্ক করেছেন, তেমনি ইয়াহুর সঙ্গে আলাপটাও দ্রুত শেষ করেছেন। ঝোলাঝুলি করেননি। অহেতুক নিজেদের দাম বাড়ানোরও চেষ্টা করেননি। এটা আমরা

জাকারবার্গের ব্যক্তিগত জীবন থেকেও দেখছি। প্রায়ই তাকে জিনস আর টি-শার্ট পরে থাকতে দেখা যায়। এর মানে হলো প্রতিদিন সকালে কোনো কাপড় পরব, এটা নিয়ে তার তেমন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হয় না।

- **টেকিং অ্যাকশন:** যা-ই চিন্তা হোক না কেন, কাজ করে ফেলাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রথম থেকে ফেসবুকের নানা পরিবর্তন নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। কোনো কোনো ফিচার প্রকাশের আগে সেটা নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। কিন্তু ফেসবুক সেটা রোলআউট করেছে। হয়তোসামান্য পরিবর্তন হয়েছে। এর মূল কারণ হলো সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা বাস্তবায়নের জন্য অ্যাকশনে। নেমে পড়া। ইচ্ছে করলে যেকোনো সিদ্ধান্তকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ হওয়াটাই মুখ্য। ফেসবুক এমন অনেক কিছু করেছে, যা আগে কেউ করেনি, এমন কাজে বেশির ভাগ সময়ই যত সমালোচনা হয়েছে, তা কাল্পনিক। এসব ক্ষেত্রে বোল্ড থাকাটা খুবই দরকার।

- সাফল্যের জন্য অপেক্ষা, উদ্ভাবনের জন্য নয়: সিলিকন ভ্যালিসহ অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি প্রাথমিক সাফল্যের পর উদ্যোক্তা হয়রান হয়ে যান। কিংবা এক ধরনের পরিতৃপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু অন্য অনেকের মতোমার্ক জাকারবার্গ কিন্তু এই ফাঁদে পা দেননি। বরং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্ভাবনের জন্য টিমকে উৎসাহিত করেছেন। নানা কিছু এক্সপেরিমেন্টও করেছেন, যা সফল হয়নি।

- সেরা লোকদের জোগাড় করেছেন।
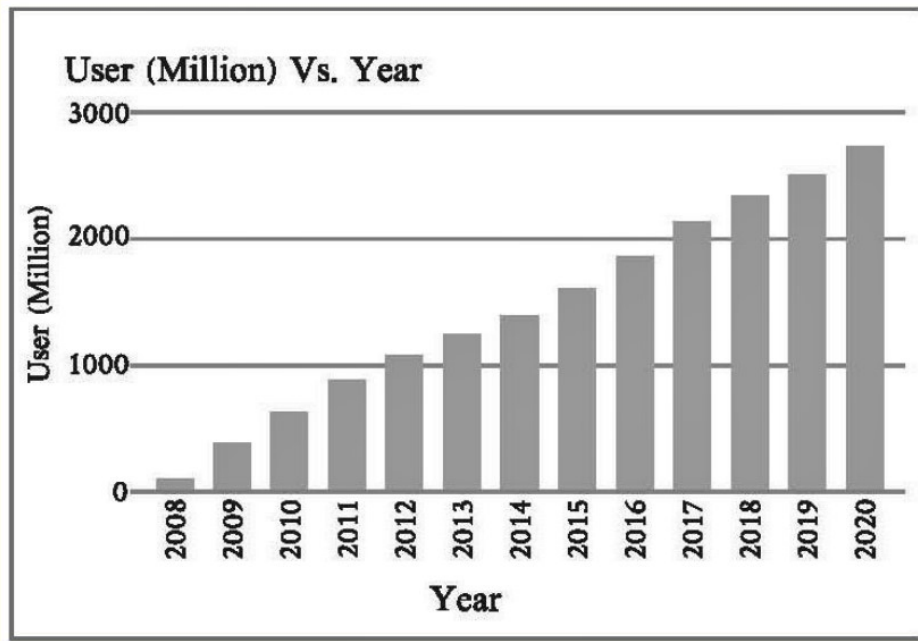
চিত্র ৬: ফেসবুকের সক্রিয় ব্যবহারকারী (Statista)

ফেসবুক খুব সুন্দরভাবে নিশ্চিত করে দেখাল, তারা অন্য অনেক কোম্পানির মতোহারিয়ে যাবে না। ফেক নিউজ মহামারির মোকাবিলায় তাদের অসাধারণ সাফল্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে ফেসবুকের প্রতি আস্থা যেন শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ছোটবড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ফেসবুকের প্রতি নির্ভরশীলতাও বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন।

গার্লফ্রেন্ডের পরামর্শে দুই বছরেই বিলিওনিয়ার

১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম শহরে আমার দিনকাল কেটেছে। চট্টগ্রাম কলেজে পড়ি। কলেজের করিডরে মিছিল করি, গুরুপদ পালিত স্যারের বাসায় সকালে কেমিস্ট্রি আর মোজাম্মেল হক স্যারের বাসায় রাতে ফিজিকস পড়ি। আর প্যারেড গ্রাউন্ডে বসে রাজা-উজির মারি। ঠিক ওই সময়ে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের হলিস্টন শহরে বাস করেন জিপকারের মার্কেটার ডায়ানা ও তার পতি টিজেএক্স কোম্পানির এইচআরের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডগলাস সিসট্রম। জায়া ও পতির কথা লিখেছি মানে হলো তাদের ছেলে-মেয়ের কথা এসে পড়বে। ঠিক তাই। এই দম্পতির ছেলে কেভিন সিসট্রমের জন্ম সেই ১৯৮৩ সালে। স্কুলে পড়ার সময়েই কেভিনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে হাতেখড়ি হয়। তারপর স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি ২০০৬ সালে। সঙ্গে সঙ্গে গুগলে চাকরি, প্রোডাক্ট মার্কেটার হিসেবে। প্রায় তিন বছর পর কেভিন ভাবলেন, তার প্রমোশন হবে অ্যাসোসিয়েট হিসেবে, কিন্তু সেটা হলো না। হতাশ আর মনের দুঃখে চাকরি ছেড়ে কেভিন চলে গেলেন নেকস্টস্টপ নামের একটা স্টার্টআপে। এটি হলো একটি লোকেশন সুপারিশের অ্যাপ। সে সময় অবশ্য ফোর-স্কয়ারের উদ্যম অনেক। কেভিনের ধারণা ছিল, ছোট টিমে অনেক রেসপন্সিবিলিটি আর কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে। হলো ঠিক তাই। এক বছরে নিজের প্রোগ্রামিং আর স্টার্টআপ স্কিল শাণিত করে কেভিন ভাবলেন, নিজেই একটা স্টার্টআপ দেবেন, ‘চেক-ইন অ্যাপ’। আমার তেমন কোনো বিশেষ আইডিয়া ছিল না।

মানে, আমরা জাস্ট একটি চেক-ইন অ্যাপ বানাব ভেবেছি। ওর ভাবনা ছিল চেক-ইন অ্যাপের সঙ্গে সোশ্যাল গেমের সমন্বয় করা। একটা প্রোটোটাইপ বানিয়ে তার আইডিয়ার কথা তিনি পিচ করেন। দুটি ভেঞ্চার ক্যাপিটালে। ওরা আগ্রহ দেখান। কেভিন চাকরি ছেড়ে দেন। মাইক ক্রেইজারের সঙ্গে মিলে Burbn বানাতে শুরু করেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা পাঁচ লাখ ডলার সিড মানি পেয়ে যান। তাদের এই চেক-ইন অ্যাপে লোকেশন জানান দেওয়া (চেক-ইন), ভবিষ্যতে কই থাকব, সেটা জানান দেওয়া (ফিউচার চেক-ইন), বন্ধুদের সঙ্গে হ্যাংআউটে গিয়ে পয়েন্ট লাভ করা, ছবি পোস্ট করতে পারাসহ অনেক কিছু করা যায়। কেভিন ও মাইকের স্থির বিশ্বাস লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কাজেই প্রায় ৬০ হাজার ডলার খরচ করে তারা Burbn লঞ্চ করলেন। তারপর থেকে প্রতিদিন গুনতে শুরু করলেন কতজন সাইনআপ করে!

চিত্র ৭: ইনস্টাগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মাইক ক্রেইগার, কেভিন সিস্ট্রম

কী মনে হয়? ৯ মাস পর তাদের গ্রাহকসংখ্যা কত হবে?

১ লাখ? ১ মিলিয়ন?

এত কম নয়! ৯ মাসে তাদের গ্রাহক হলো মাত্র ৮০ জন। জি। মাত্র ৮০ জন। এর বেশির ভাগই কেভিন আর মাইকের বন্ধু, যারা কিনা না করতে পারে না। ওদের গার্লফ্রেন্ডরাও ছিল।

শান্তির জন্য কেভিন মেক্সিকোর একটি হোস্টেলে ছুটি কাটাতে যাওয়ার কথা ভাবলেন এবং নিজের আর গার্লফ্রেন্ডের জন্য দুটি টিকিট কাটলেন। টপটক অনুষ্ঠানে আমি আমার অতিথিদের কাছে জানতে চাই আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ কোনটি? এই প্রশ্ন যদি আমি কেভিনকে করি, তাহলে তিনি জবাব দেবেন— গার্লফ্রেন্ডের জন্য কেনা ওই টিকিটটা!!!

মেক্সিকোতে কেভিন তার গার্লফ্রেন্ডের কাছে জানতে চাইলেন, ‘আচ্ছা তুমি কেন Burbn-তে ছবি পোস্ট করছ না? জবাবে বান্ধবীর সরল জবাব, ‘আমার আইফোন-৪-এ তোলা ছবিগুলো বন্ধুদের মতো সুন্দর নয়। বন্ধুরা ফিল্টার ব্যবহার করছে। তুমিও হয়তো ফিল্টার ব্যবহার করতে পারো।’

চিত্র ৮: কেভিন ও তার স্ত্রী নিকোল শোয়েটস

‘সেদিন বাইরে থেকে হোস্টেলে ফেরার পর আমি সরাসরি আমার ল্যাপটপে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং আমি আমাদের প্রথম ফিল্টার X-ProII তৈরি করলাম।’

মেক্সিকো থেকে ফেরার পর মাইকের সঙ্গে আলাপ করে তারা ঠিক করলেন— তাদের অ্যাপে হাজার হাজার অপশন থাকার দরকার

নেই। একটিই যথেষ্ট। কাজে তারা Burbn থেকে ফটো শেয়ারিং অপশন রেখে বাকি সবকিছু ফেলে দিলেন।

যে অ্যাপ instantly ক্যামেরার ছবিকে Telegram-এর স্পিডে পাঠিয়ে দেয়, তার নাম কী দেওয়া যায়? Instagram। আর প্রথম দিনই নতুন অ্যাপ ডাউনলোড হলো মাত্র ২৫ হাজার।

এক মাসের মধ্যে ব্যবহারকারীর সংখ্যা হয় ১০ লাখ, এক বছরেই ১ কোটি। ২০১২ সালের এপ্রিলে ফেসবুক ইনস্টাগ্রামকে কিনে নিল ১ বিলিয়ন ডলারে! শেয়ারের হিসাবে কেভিনের ভাগে পড়ল ৪০০ মিলিয়ন ডলার! ২০১৮ সালে রিজাইন করার আগ পর্যন্ত কেভিন ইনস্টাগ্রামের সিইও ছিলেন। এখন নতুন কিছু করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার একটি ওয়েবসাইট আছে, যেখানে মেশিন লার্নিংসহ নানাবিধ নতুন জিনিস নিয়ে তার জানাশোনা শেয়ার করছেন নিয়মিত। ২০১৬ সালেই কেভিন আমেরিকার ৪০ বছরের কম বয়সী বিলিওনিয়ারদের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়ে ফেলেন। সেই বছরই কেভিন বিয়ে করেন।

২০১৪ সালে সিলিকন ভ্যালির স্টার্টআপ স্কুল কেভিনের একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে। সেখান থকে কয়েকটা লাইন—

'The hardest part is finding the problem to solve; solutions come pretty easy.'–সমাধানের জন্য একটি সমস্যা খুঁজে পাওয়াটাই হচ্ছে আসল। তারপর এটার সমাধান পাওয়া যাবেই। সমাধান এমনকি খুব সহজ হতে পারে। উবার, এয়ার বিএনবির কথা ভাবেন তো।

'You're never ready, but that's the fun part.'–সবকিছু শিখে, জেনে-বুঝে তারপর কাজে নামব— এই বুদ্ধি কিন্তু খুব একটা কাজে লাগবে না। এ হচ্ছে আমাদের চাকরি খুঁজব না চাকরি দেব—এর ট্যাগলাইন— পথে নামলেই পথ চেনা যায়। ২৬ বছর বয়সে একটা বিলিয়ন ডলার কোম্পানি তৈরি করতে হলে পথে নামতে হবে, বেশি অপেক্ষা করতে হবে না।

'One day on the job is more than one year in a book.' - প্রচুর পড়তে হবে কিন্তু তার চেয়ে বেশি হলো, যা পড়া হবে, সেটা কাজে লাগাতে হবে। ২০১৪-১৫ সালে আমি কয়েকজনকে দেখেছি, যারা অধিকাংশ সেশনে যোগ দিয়ে জানাত, তারা এন্ট্রাপ্রেনিউর হতে চায়। সে জন্য সভা-সমিতি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের আমি কখনো কাজে নেমে পড়তে দেখিনি। ফলে তারা এখনো সে অবস্থাতেই আছে। কেভিনের প্রিয় দুটি বই হলো রে ডবলিউর প্রিন্সিপল ও এরিক রাইসের দ্য লিন স্টার্টআপ। লিস স্টার্টআপের বাংলা অনুবাদও হয়েছে।
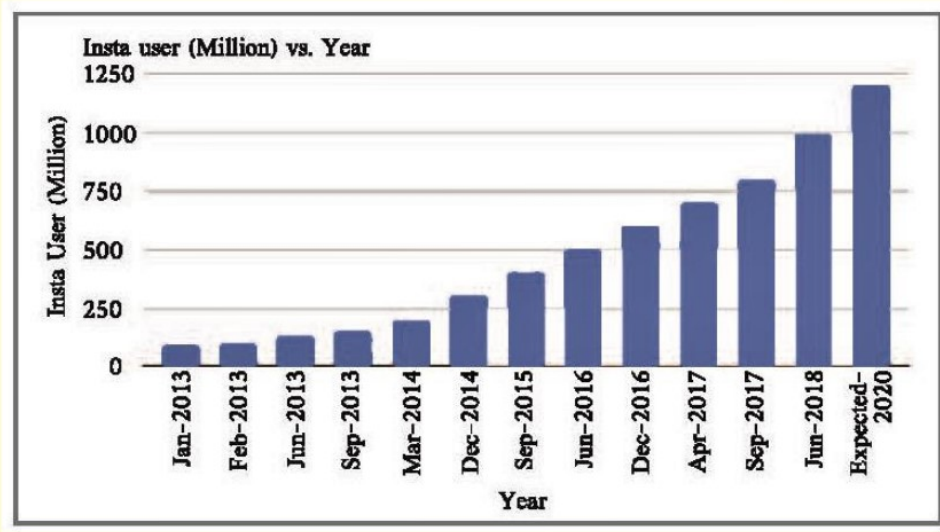
চিত্র ৯: ইনস্টাগ্রামের ব্যবহারকারী (Businessapp.com)

ইনস্টাগ্রাম কেন সফল অ্যাপ, সেটার কয়েকটি সহজ কারণ আমার পাঠকেরা সহজে বের করতে পারবেন বলে আমার ধারণা। কাজে আমি আমার পন্ডিতি ফলাতে গেলাম না। সেই কারণগুলোর একটি হতে পারে কোন গার্লফ্রেন্ডের কোন পরামর্শটা নিতে হবে, আর কোনটা নিতে হবে না— সেটা সম্পর্কে দারুণ একটা বোধ থাকা।

যাদের গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক, তাদের জন্য শুভকামনা।

দাম মাত্র ২৭ বিলিয়ন ডলার

বুয়েটে ভিস্যাট বসানোর পর আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করার। এর আগে আমাদের শুধু ই-মেইল সেবা চালু ছিল। টেলিফোনের মাধ্যমে। একটা টেলিফোনে আমাদের ই-মেইল সার্ভার কানেক্টেড ছিল ব্র্যাক বিডিমেইলের সঙ্গে। আর একটা টার্মিনাল সার্ভার হয়ে ১৬টা পিএবিএক্স ফোন ছিল অথেনটিকেশন সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত। ফ্রি-রেডিয়াস নামের একটি সিস্টেম সেখানে চলত। এই টোটাল সিস্টেমটা চালাতেন বিডিমেইলের লোকেরা।

তো, আমি ভাবলাম শুরু করি টার্মিনাল সার্ভার দিয়ে। কারণ, একটা এক্সট্রা সার্ভার ছিল। লিনাক্সের ম্যানড্রেক ভার্সন ব্যবহার করে আমি কাজ শুরু করলাম। তারপর দেখলাম একটা সমস্যা। টার্মিনাল সার্ভার ঠিকই কানেক্ট হয় কিন্তু তারপরই ছেড়ে দেয়। সহজ সমাধানের উপায় হলো শহরের বিখ্যাত কোনো সিসএডকে ফোন করা। আমিও তাই করলাম। তিনি সব শুনে বললেন—

‘আপনার লিনাক্স কোনটি?

— ম্যানড্রেক। ভার্সন অমুক (এখন মনে নেই)।

— ‘এটাই সমস্যা। আপনি স্ল্যাক ওয়্যার (Slackwire) ব্যবহার করেন। তাহলে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। ঢাকা শহরে কেউ ম্যানড্রেক ব্যবহার করে না।’

এই প্রথম আমি স্ল্যাক শব্দ শুনলাম। আমি অবশ্য ওই বড় ভাইয়ের উপদেশ নিইনি। খুঁজে বের করেছিলাম কেন আমার টার্মিনাল সার্ভার

কথা বলে না আমার ম্যানড্রেকের সঙ্গে। তারপর সেই সহজ সমাধানটা করেছি।

যাক, গত কয়েক দিন স্ল্যাকের (Slack) কথা সামনে আসাতে পুরোনো এই স্ল্যাক ওয়্যারের কথা মনে পড়ল। কয়েক বছর আগে থেকেই এই নতুন স্ল্যাকের কথা জানি। একটা কোলাবোরেটিভ অ্যাপ। মানে টিম বা অফিসের কাজ ম্যানেজ করার জন্য একটা মেসেজিং অ্যাপ। তবে নিজের ব্যবহার করার শখ হয়নি। কারণ, আমার টিমগুলো ছোট। এটা সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে থাকে। আর একটা কোনো কথা শোনে না। কাজে কী লাভ?

ইন্টারনেটের বিকাশের পর থেকে তাকে পুঁজি করে একই টিমের লোকজন নানা জায়গা থেকে কাজ করতে শুরু করল। তখন তাদের জন্য যোগাযোগের একটা বড় মাধ্যম হলো ই-মেইল। টু/সিসি/বিসিসিরমারপ্যাঁচে লোকজন নিজের কাজের নির্দেশ পেলএবং আবার সেটা আপডেট করল। স্ল্যাক হলো এ কাজে ই-মেইলের একটা সহজ রিপ্লেসমেন্ট। নির্দিষ্ট চ্যানেলে গিয়ে শুধু কাজের কথা লিখলেই টিমের সবাই কিন্তু বুঝতে পারছে। দেখা গেল এটি বেশ কাজের। কাজের বলেই প্রতিদিন ১ কোটি ২০ লাখ টিম এই সেবা ব্যবহার করে। তবে, এসব কারণে আমি নতুন করে স্ল্যাকের কথা শুনিনি। শুনেছি কারণ কিছুদিন আগে (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার, ১ ডিসেম্বর) সিআরএম সফটওয়্যারের অন্যতম পুরোধা সেলসফোর্স মাত্র ২৭.৭ বিলিয়ন ডলারে স্ল্যাককে কিনে নিয়েছে!!! এটি গত কয়েক বছরের মধ্যে অন্যতম বড় মার্জার বলা যায়। এর আগে ফেসবুক কিনেছে হোয়াটসঅ্যাপকে ১৯.৬ বিলিয়ন ডলারে। মাইক্রোসফট কিনেছে লিংকডইনকে ২৬ বিলিয়ন ডলারে। লিংকডইনকে সেলসফোর্স কিনতে চেয়েছিল যদিও। তো, স্ল্যাকের দাম উঠল ২৭.৭ বিলিয়ন ডলার। কেন?

দেখা যাক স্ল্যাক কেমন করে এই উচ্চমূল্যে উঠেছে।

যেকোনো জায়গা থেকে এটি শুরু করা যায়। তবে গল্পের শুরু হয়তো ২০০৯ সালে। কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে। স্টুয়ার্ট বাটারফিল্ডের হাতে কিছু সময় এবং মাথার মধ্যে অনেকে খেলতে পারে এমন অনলাইন

গেম বানানোর পোকা। ভাবছে নতুন কিছু করা যাক। স্টুয়ার্টকে লোকজন চেনে ফটো শেয়ারিং ওয়েবসাইট ফ্লিকারের একজন সহউদ্যোক্তা হিসেবে। স্ত্রী ক্যাটেরিনা ফেকের সঙ্গে এই উদ্যোগ। এই ফটো শেয়ারিং সাইটটা ২০০৫ সালেই ইয়াহু কিনে নিয়েছে। গুগলের ফটো সার্ভিস জনপ্রিয় হওয়ার আগে আমাদের অনেকে এই সার্ভিসের ভক্ত ছিল। তবে, ফ্লিকারের জন্য কিন্তু একটি গেম বানানোর জন্য। গেম নেভারএন্ডিং নামের একটি গেম বানানোর জন্য ফ্লিকারের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু গেমটা শেষ পর্যন্ত ক্লিক করেনি। কিন্তু সাইড কাজ হিসেবে ফটো শেয়ারিংয়ের ওয়েবসাইট ফ্লিকারের জন্ম ও ২২ মিলিয়ন ডলারে ইয়াহুর কিনে নেওয়া। তারপর স্টুয়ার্ট ইয়াহুতে চাকরি করেন ২০০৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে ২০০৭ সালে স্ত্রীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

চিত্র ১০: স্ল্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্টুয়ার্ট বাটারফিল্ড

১৯৭৩ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ডামাডোলের সময় কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া অঙ্গরাজ্যের লন্ড গ্রামে স্টুয়ার্টের জন্ম। নরমা ও ডেভিড বাটারফিল্ডের ঘরে। নাম রাখা হয় জেরেমি বাটারফিল্ড। ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার জন্য ডেভিড আমেরিকা থেকে পালিয়ে সেখানে চলে যান। জন্মের পর স্টুয়ার্টের পাঁচ বছর কেটেছে কমিউনের সঙ্গে। থাকেন একটা লগ-কেবিনে, যেখানে বিদ্যুৎ বা পানির সাপ্লাই নেই। পাঁচ বছর পর ডেভিড পরিবার নিয়ে ভিক্টোরিয়া প্রদেশে চলে যান।

সেখানে টুয়ার্ট সেন্ট মিখায়েল ভার্সিটি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। নিজে নিজেই কোডিং শেখে এবং নিজেই নিজের নাম রাখেন স্টুয়ার্ট। স্কুলের ওয়েবসাইটের কাজ করেন ও কিছু টেকাটুকাও আয় করেছেন। সে সময়। এরপর ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে দর্শনে বিএ ডিগ্রি ও ১৯৯৮ সালে কেমব্রিজ থেকে মাস্টার্স করেন।

২০০০ সালে স্টুয়ার্ট জেসন ক্লেসনের সঙ্গে মিলে গ্রেডফাইন্ডার নামে একটা স্টার্টআপ দাঁড় করে সেটা বিক্রি করেন। তারপর কিছুদিন ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেন। ২০০২ সালে আবার জেসন ক্লেসনের সঙ্গে মিলে শুরু করেন লিডকর্প নামের প্রতিষ্ঠান। এবার সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী ক্যাটেরিনা ফেইক। গেম নেভারএন্ডিং নামের মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম বানানোর চেষ্টা তারা করলেও সেটি সফল হয়নি। কিন্তু তাদের ফটো শেয়ারের ওয়েবসাইটটি ইয়াহু কিনে নেয়, যা আমরা আগেই জেনেছি।

ইয়াহুর কাজ ছেড়ে ২০০৯ সালে স্টুয়ার্টের হাতে ভালো সময় এবং টাকাকড়িও মন্দ নেই। কাজে দ্রুত নিজের টিম বানালেন স্টুয়ার্ট। সঙ্গে নিলেন ফ্লিকারের চিফ সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট ক্যাল হেন্ডারসন, ফ্লিকারের আরেকজন কর্মী এরিক কস্টেলো এবং ইয়াহু অধিগ্রহণের পর ফ্লিকারে কাজ করা ইয়াহুর কর্মী সাঞ্জুয়েল মৌরাশভকে। তাদের পরিকল্পনা হলো— একটি দৃষ্টিনন্দন নন-কমব্যাট ম্যাসিভলি মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম। কোম্পানির নাম টাইনি স্পেক (Tiny Speck)। জন্ম হলো গ্লিচের (Glitch)। ওয়েবসাইটে লেখা- 'we are working on something huge and fun and we need help' এটি ২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। সে সময় টেকক্রাঞ্চের এক রিপোর্টারের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, "টাইনি স্পেক কোম্পানি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না। তারা কী করবে, সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু তারা জানিয়ে দিচ্ছে, তারা একটা কিছু তৈরি করবে। মজার ব্যাপার হলো এই রিপোর্টার কিন্তু টাইনি স্পেকে ঠিকই বিনিয়োগ করেছে। কারণ, তার ধারণা— এটা একটা অ্যানিমেটেড মুভির মতোগেম এবং ফাটাফাটি হবে।

২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে ব্রাউজারভিত্তিক গেম গ্লিচ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এক্সেসিবিলিটির দোহাই দিয়ে নভেম্বরেই সেটা বেটা স্টেটে চলে যায়। ওই সব সমস্যা কিন্তু সমাধান হলো না। পরের এক বছর অনেক খাটাখাটুনি করেও গেমটা আর দাঁড়াল না। ২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্লিচ বন্ধ হয়ে গেল।

গ্লিচ নিয়ে কাজ করার সময় স্টুয়ার্ট ও দলবল একটা সহজ বুদ্ধি করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের। সেটা হলো একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল। নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছেন। ২০১২-এর শেষের দিকে যখন তারা টের পেলেন গ্লিচের কপাল মন্দ, তখন তারা এই ইন্টারনাল কমিউনিকেশন চ্যানেলটার প্রতি নজর দিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে, অর্থাৎ মার্চ ২০১৩ সালের মধ্যে মাটোমুটি একটা অবস্থায় গেল তাদের এই কমিউনিকেশন সেটআপ। নিজেদের টিমের অনেক কাজ তারা সেখানে করলেও, সেটা একটা মাত্র টিম। রিলিজ করলে যখন অনেক টিম একসঙ্গে ব্যবহার করতে চাইবে। তখন কী হবে?

এই চিন্তা থেকে আমরা আমাদের বন্ধুদের হাতে-পায়ে ধরলাম যেন কয়েকজন আমাদের স্ল্যাক ব্যবহার করে। একটি পডকাস্টে স্টুয়ার্ট সেই সময়কার দুটি প্রতিষ্ঠানের কথা স্মরণ করেছেন। এর একটি হলো কোজি, যা কিনা বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের নিয়ে কাজ করে এবং আর একটি মিউজিক সার্ভিস আরডিও (Rdio)। এ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সেটি ব্যবহার করতে শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাক দলবল আবিষ্কার করল। টিমের সাইজ বড় হলেই স্ল্যাকের আচরণ পাল্টে যেতে হবে। স্টুয়ার্টের সরল স্বীকারোক্তি 'আরডিও শুরুতে কেবল তাদের ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপারদের জন্য স্ল্যাক ব্যবহার করলেও অচিরেই তাদের ১২০ জন কর্মী এতে যোগ দিলেন। আর আমরা টের পেলাম স্কেল-আপের ঝামেলা।

এই ফিডব্যাকটা খুবই জরুরি ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাকের নানান ফিচার ঠিক করলেন। বিশেষ করে কোনো টিমের সদস্যসংখ্যা বাড়তে থাকলে সেটা কীভাবে সামাল দেবেন, সেটাই ছিল সবচেয়ে বড়

চ্যালেঞ্জ। স্টুয়ার্ট জানাচ্ছেন, তখন তাদের একটাই কাজ— ফিডব্যাক বিশ্লেষণ এবং সে অনুযায়ী স্ল্যাকের পরিমার্জন।

সামারের মধ্যে মাটোমুটি বেশ অগ্রগতি হলো এবং ২০১৩ সালের আগস্টে (শুরুর সাত-আট মাসের মধ্যে) তারা স্ল্যাকের প্রিভিউ রিলিজ করে দিলেন। স্টুয়ার্টের ভাষায়, 'এটা বেটা রিলিজ ছিল। কিন্তু আমরা সেটা বলি নাই। কারণ, কেউ কেউ মনে করতে পারে, এটাতে এখনো অনেক কাজ বাকি।'

এই রিলিজের জন্য তারা হায়ার করলেন একটা পিআর ফার্ম। পিআর ফার্মটি একটা আর্টিকেল ও কয়েকটা নিউজ প্রকাশ করল। যেখানে স্ল্যাকের সিইও স্টুয়ার্ট বাটারফিল্ড লোকজনকে অনুরোধ করেছেন, তাদের অ্যাপ ব্যবহার করে দেখার জন্য। প্রথম দিনেই ৮ হাজার লোক যোগ দিল। দুই সপ্তাহের মধ্যে সেটি ১৫ হাজারে উঠল।
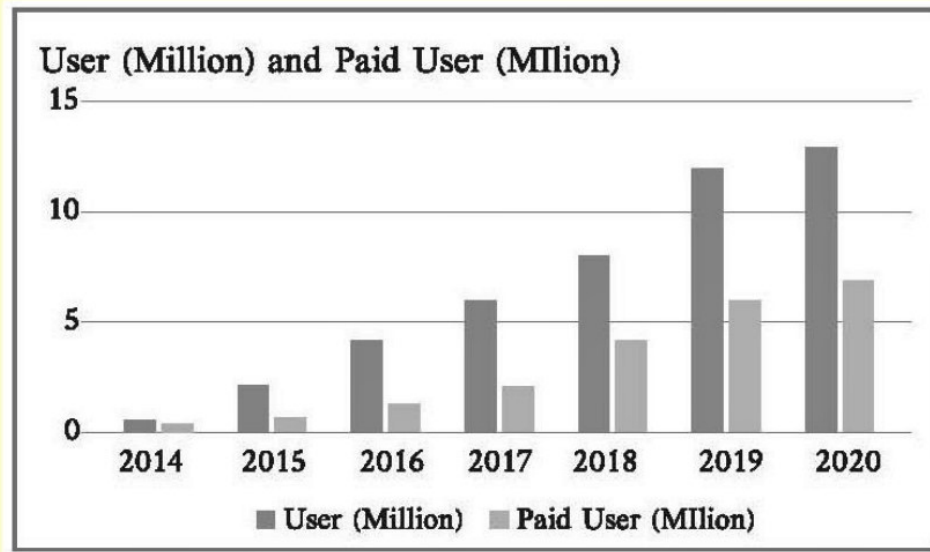
চিত্র১১: স্ল্যাকের পেইড গ্রাহক ও গ্রাহকসংখ্যা

(www.businessofapps.com)

পিআর এই কাজটা করতে পারল দুটি কারণে। একটা হলো স্টুয়ার্টের আগের সাফল্য। এ ছাড়া মাসখানেক ধরে স্ল্যাক টিমের সঙ্গে পিআর টিমের যোগাযোগের ফলে তারা গল্পটা ঠিকমতোতুলে ধরতে পারল। পত্রপত্রিকায় তাদের নিউজ প্রকাশের পর বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় স্ল্যাক টিম একই নিউজ একাধিকবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করল। সেটি চোখে পড়ল যারা ব্যবহার করছে তাদের। তারাও সেই

আলোচনায় যোগ দিল। বাটারফিল্ডের হিসাব হলো— পত্রিকায় নিউজ করতে পারাটা হলো ২০%। ৮০%-ই হলো সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা নিয়ে আলোচনা করা, সরব থাকা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার দেওয়ার সময় অনেকেই ভাবে 'বেশি হয়ে যাচ্ছে। আগেই তোদিয়েছি একবার। কিন্তু এই চিন্তাটা মোটেই ঠিক নয় বলে মনে করেন স্টুয়ার্ট। তার বক্তব্য সোজা। টপ অব দ্য মাইন্ডে থাকতে হবে।

স্ল্যাকের কাছ থেকে আর একটা বড় বিষয় শেখার আছে। সেটা হলো রিলিজের পর প্রোডাক্টের প্রতি নজর দেওয়া। সেটা বেটা রিলিজ হোক বা ফাইনাল রিলিজ হোক। প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অব্যাহত রাখতে হবে এবং এই জন্য সব ফিডব্যাকই জরুরি। স্ল্যাক প্রায় ৬ মাস তাদের প্রিভিউ রিলিজে স্টিক ছিল। এ সময় সব ফিডব্যাকই তারা বিবেচনা করেছে।

এই সময় তারা বিভিন্ন টিমকে দলে দলে আমন্ত্রণ জানায় এবং লক্ষ করে তাদের যোগ দেওয়ার ফলে অ্যাপের অবস্থা। কিছু কারেকশন। করে আবার রিলিজ দেওয়া এবং আবার পর্যবেক্ষণ— এটা চলতেই থাকে।

তবে এই ছয় মাসে তাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে সফটওয়্যার। সেলস। শুরু থেকে তারা ব্যক্তির কাছে অ্যাপ বিক্রির চেষ্টা করেনি। শুরু থেকে তারা টিমের কাছে বিক্রির চেষ্টা করেছে। ফাংশনাল টিম, বড় টিম এবং সবশেষে প্রতিষ্ঠান। এখানে স্টুয়ার্ট একটা বিশেষ বুদ্ধি খাটালেন। কারণ, এই ধরনের কোলাবোরেটিভ টিম সফটওয়্যার বাছাইয়ে সবাই সব সময় একমত হয় না। যে কেউ একজন ভেটো দিতে পারেন। স্টুয়ার্ট এই ভেটো অ্যাভয়েড করলেন এভাবে, "পাঁচজনের পছন্দ, পাঁচজনই আসেন। তারপর তারা জোর দিলেন। কিছু কাগজপত্র বা প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়াল বানানোতে। "স্ল্যাক কী, কেন ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যাবে এমন ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা বানিয়েছি ব্যক্তিকে টার্গেট করে। কিন্তু পাশাপাশি আমরা দলনেতাদের জন্যও প্রচুর

ম্যাটেরিয়াল তৈরি করেছি। কারণ, আমরা চেয়েছি দলনেতাদের যেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতোপ্রচুর রসদ থাকে হাতের নাগালে।’

গ্রুপ কমিউনিকেশনে স্ল্যাকের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কাজেই বলা যায়, নতুন এই ফিল্ডে টিকে থাকার জন্য অনেক খাটাখাটুনির প্রয়োজন। ব্যবহারকারীদের জন্য প্রচুর নির্দেশিকা তৈরির ব্যাপারটা তাই তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রধান নির্বাহীর ভাষ্য হচ্ছে, ‘২০-৩০% ব্যবহারকারী আমরা পেয়েছি অন্যান্য গ্রুপ-মেসেজিং সিস্টেম যেমন হিপচ্যাট, ক্যাম্পফায়ার বা আইআরসি থেকে। কিন্তু মেজরিটি আসলে বলেছে তারা এ রকম কিছু ব্যবহার করে না। কিন্তু আরও ভালোভাবে জানার চেষ্টা করাতে বোঝা গেল, তাদের কেউ মেসেঞ্জার, কেউ এডহক ই-মেইল, কেউবা এসএমএস ব্যবহার করে। কেউ কেউ গুগল+ পেজ বা ফেসবুক গ্রুপ তৈরি করে নেয়। স্ল্যাক এদেরও টার্গেট করে।

তবে ব্যক্তির চেয়ে কোম্পানির কাছে কোনো কিছু বেচা কিন্তু অত সোজা না। ছোট স্টার্টআপের বেলায় একটি টিম হয়তোএকটি কোম্পানি, কিন্তু বড়দের বেলায়? সে জন্য টিম বলতে স্ল্যাক কোম্পানিকে না বুঝিয়ে যেকোনো টিমকে বোঝায়। মানে হলো কোনো প্রতিষ্ঠান হয়তোপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্ল্যাক ব্যবহার করছে না, কিন্তু এর কোনো মিড-ম্যানেজার স্বাচ্ছন্দ্যে তার টিম নিয়ে স্ল্যাকে ঢুকে যেতে পারেন। এতে দেখা গেল এডোবের ৯টা গ্রুপ পেইড ভার্সন কিনে বসে আছে।

স্টুয়ার্ট ও তার দলবল কাস্টমারদের যত জানায়, তার চেয়ে বেশি শোনার জন্য কান পেতে রাখে। একটা ডেডিকেটেড টিম রাখা হয়, যারা কিনা সার্বক্ষণিকভাবে টুইটারে নজর রাখে। পাশ্চাত্যে বেশির ভাগ ব্যবহারকারী তাদের রিভিউ প্রকাশ করে টুইটারে, এক লাইনে। যেকোনো সমালোচনা স্ল্যাক টিম গ্রহণ করে। যখনই কোনো অভিযোগ পাওয়া যেত, সেটাই ঠিক করা হতো।

স্ল্যাকে সবাই চ্যানেল তৈরি করে। একটি ছোট টিমের জন্য এমন চ্যানেলের সংখ্যা বাড়লেও সেটা ম্যানেজযোগ্য। তবে যখনই কিনা টিমের সাইজ বড় হয়ে যাচ্ছে, তখনই নতুন কারও পক্ষে বোঝাটা

কঠিন হয়ে যাচ্ছে, সে কোথায় যোগ দেবে। আরডিও টিমের এমন সমস্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাকওয়ালারা এটির সমাধান বের করে ফেলে। সেটা হলো প্রতিটি চ্যানেলের একটা ডেসক্রিপশন যোগ করে দেওয়া এবং কতজন মেম্বার আছে, সেটা জানিয়ে দেওয়া। এভাবে ব্যবহারকারীদের ফিডব্যাকই স্ল্যাককে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে।
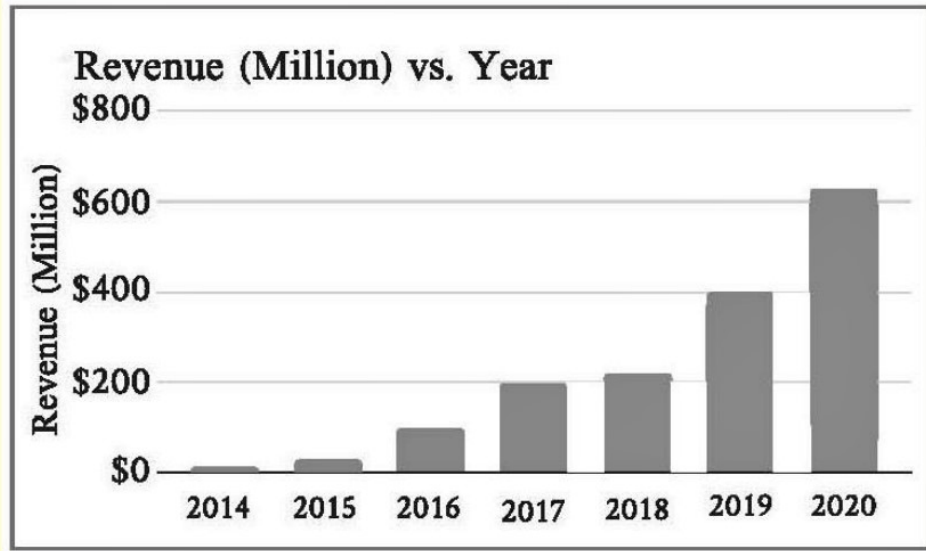
চিত্র ১২: স্ল্যাকের রেভিনিউ (www.businesSofapps.com)

কতটা শক্তিশালী?

সেটা আমরা ১ ডিসেম্বর, ২০২০-এ বুঝতে পারলাম। ২৭.৭ বিলিয়ন ডলারে সেলসফোর্স কিনে নিল স্ল্যাককে।

এর ফলে সেলসফোর্স আর স্ল্যাকের লাভ কী হবে, সেটা এই পোস্টের উপজীব্য নয়। আমি বোঝাতে চেয়েছি, স্ল্যাকের মতোবিলিয়ন ডলার। কোম্পানি থেকে কী কী শেখার আছে। সেটিই বর্ণনা করেছি এই প্রবন্ধে।

বেচতে জানলে লুঙ্গি কি, বেডিং কি...

আমাদের ছোটবেলায় বিটিভিই ছিল একমাত্র অনস্ক্রিন বিনোদন। সিনেমা হলে যেতে শুরু করি মনে হয় ক্লাস এইটে ওঠার পর। তো, টেলিভিশনে তখন অনেক মজাদার কার্টুন দেখাত। এর মধ্যে 'ক্যাসপার- দ্য ফ্রেন্ডলি গোস্ট' ছিল আমার অন্যতম প্রিয়। এতই প্রিয় যে আমি এখনো এর শুরুর মিউজিকটা মনে করতে পারি। ক্যাসপার ভূত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে উড়ে যায় আর গাইতে থাকে- I am Casper, Friendly Ghost...। কাজেই ক্যাসপার বললেই মাথাতে ওই ভূতের বাচ্চাটার কথাই আসে।

এর মধ্যে বিজ্ঞানচিন্তার বদৌলতে জানলাম জিন কাটাকাটির একটা সিস্টেমের নামও ক্যাসপার। এই বুদ্ধিতে নাকি এমন আপেল হবে, যা কেটে রেখে দিলে লাল হবে না !!!

এ পর্যন্ত জেনে খুশি ছিলাম। কিন্তু দুই দিন ধরে যে ক্যাসপারের কথা শুনতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। নিকটতম আত্মীয় হলো লুঙ্গি।

জি, লুঙ্গি। ছোটবেলা থেকে এখনো আমাদের রোহিতপুরের লুঙ্গির বড় কারবার হলো কেনার পর সেলাই করা। এখন অবশ্য অনেক সেলাই করা লুঙ্গি পাওয়া যায়।

এই সেলাই করা লুঙ্গির সূত্রপাত করেন সাফাত সাত্তার বাপ্পী। সলিমুল্লাহ খান ভাই বলেন, বাপ্পী নাকি ছোটবেলায় বলতেন তিনি

টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে লুঙ্গির ব্যবসা করে দেখাবেন। সেটাই তিনি দেখিয়েছেন কয়েক দশক আগে (১৯৯৪-৯৫ সালে মনে হয়)। প্রেস্টিজ লুঙ্গি নামের একটি লুঙ্গির ব্র্যান্ড তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথম দেড়-দুই বছরে এক কোটি টাকার লুঙ্গি বিক্রি করে রেকর্ড করেন। বিটিভিতে প্রেস্টিজ লুঙ্গির বিজ্ঞাপন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। এবং লুঙ্গিও একটি বিজ্ঞাপনযোগ্য পণ্য হয়ে ওঠে, যা আগে কেউ ভাবেওনি। এখন তো১০ হাজারি লুঙ্গিও পাওয়া যায়। সাফাত সাত্তার আসলে দেখিয়েছেন 'বিক্রি করতে জানলে একটি সাদামাটা পণ্যকেও একেবারে শীর্ষে নিয়ে যাওয়া যায়।

পুরো গল্পটা মনে পড়ছে। কারণ, আমেরিকার একটি স্টার্টআপ বেডিং (ম্যাট্রেস) বিক্রি করে এবার ১.১ বিলিয়ন ডলারের (১১০ কোটি ডলার) কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে !!! আর এটির নাম ক্যাসপার।

২০১৪ সালে ক্যাসপার যখন ঘোষণা করে তারা আমেরিকার বেডিংশিল্পে একটা ভজকট লাগাবে, তখন কেউ সেটা বিশ্বাস করেনি। কোনো বিনিয়োগকারীর আগ্রহের তোপ্রশ্নই ওঠে না। আমেরিকায় ভালো বেডিং ২০০০+ ডলারে বিক্রি হয়।

আমেরিকার বেডিং বাজার কমবেশি ১৪ থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলারের। আর এর গ্লোবাল মার্কেট আগামী ৫ বছরে ৩৯ বিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে কেউ কেউ ধারণা করছে। ক্যাসপার কাস্টম-মেইড ম্যাট্রেস তৈরি করে সেটি একটি বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলতে পারে। এটি বহুস্তরী এবং ফোমের তৈরি। এগুলো ৩৫০ ডলার থেকে ২৭৫০ ডলার দামে বিক্রি হয়। ইন্টারেস্টিং হলো ১০০ দিনের ফ্রি ট্রায়ালও দেওয়া যায়! মানে ইচ্ছে করলে ১০০ দিন ব্যবহার করে না কিনে ফেরত দিতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠাতারা তাদের প্রথম বছরে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন ডলারের জাজিম বিক্রি করবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু তারা মাত্র দুই মাসে এই সংখ্যা অর্জন করে। বিক্রিবাট্টা বাড়ানোর জন্য তারা বিভিন্ন সেলিব্রেটি এনডোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করে। এর মধ্যে ছিলেন অভিনেতা লিওনার্দো

ডিক্যাপ্রিও ও অ্যাশটন কুচার এবং র্যাপার ন্যাসের মতোখ্যাতিমান ব্যক্তিরা। এই এনডোর্সমেন্ট দ্রুত তাদের পণ্যের খবর অনেকখানি ছড়িয়ে দেয়। কাইলি জেনারের একটা এনডোর্সমেন্টের জন্য তারা ৮ লাখ ৭০ হাজার লাইক কামাই করেছে ইনস্টাগ্রামে। ব্র্যান্ডের দ্রুত এই বিকাশ তাদের বড় বড় বিনিয়োগকারীর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

চিত্র ১৩: ক্যাসপারের সিইও ফিল করিম বসে আছেন নিজেদের তৈরি বিছানায়।

তবে তারা ট্র্যাডিশনাল ব্যাপারগুলোও দেখেছে। লোকেরা সাধারণত প্রতি ৮ থেকে ১০ বছরে একটি জাজিম বা ম্যাট্রেস কিনে থাকে। আমেরিকায় জাজিমের ব্যবসা করে এমন ২০০-এর অধিক কোম্পানি আছে। ক্যাসপার লক্ষ করেছে বেশির ভাগ কোম্পানি প্রত্যেক গ্রাহককে আলাদা ভাবে না। তারা হরেদরে জাজিম বিক্রি করে। ক্যাসপার এ জায়গা নিয়েই কাজ করেছে। বিক্রির ব্যাপারটাকে তারা। একটি দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের শুরু হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের বেচা শুরু হয় কথা বলে। গ্রাহকদের অর্ধেকই ঘরে বসে তাদের কাস্টমার কেয়ারে কথা বলে। প্রশ্নগুলো প্রযুক্তিগত, যেমন 'আমার কি একটি স্প্রিং বক্স দরকার হবে বলে মনে হয় আপনার?

– না

‘এটি কি এ ধরনের বেড ফ্রেমে কাজ করে?

— হ্যাঁ।

ক্যাসপারের কর্মীরা জানায়, আমরা গ্রাহক সম্পর্কে কিছু শিখতে প্রতিটি কথাপকথন ব্যবহার করি। আমরা জানি, আপনার কতক্ষণ বিছানা পাতা ছিল এবং যদি আপনার বাচ্চা বা পোষা প্রাণী থাকে, তা-ও আমরা জানি। আমরা সেগুলো সন্ধান করি জিপিএস দিয়ে এবং তারপর ক্রেতাদের বার্ষিক উপহার হিসেবে কুকুর বা বিছানা প্রেরণ করি। এটি কেবল শুধু একবার বিছানা বিক্রির ব্যাপার নয়, সবাইকে সবচেয়ে বড় কাস্টমারে পরিণত করার প্রচেষ্টা।’

ক্যাসপারের ল্যাবগুলোতে গ্রাহকদের ডেটাবেস রয়েছে। যাদের নিয়মিত দাওয়াত দেওয়া হয়, নতুন জাজিম পরীক্ষা করে দেখার জন্য। তাদের প্রায় ১৫ হাজার গ্রাহক পণ্য উন্নতির প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে আছে।

ক্যাসপারের একটি ঘুমের ট্র্যাকিং অ্যাপ আছে। লোকে চাইলে তাদের ঘুমের প্যাটার্ন এখানে খেয়াল করতে পারে। এতে ক্যাসপারও ঘুমের রসায়ন সম্পর্কে আরও জানতে পারছে। এ রকম লোকদের নিয়ে তারা কিছু গ্রুপও তৈরি করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যা কিনা তাদের মার্কেটারের ভূমিকা পালন করে।

আরও একটি বিষয় ক্যাসপার লক্ষ করে, যা কিনা অন্য জাজিমওয়ালারা বেশি গুরুত্ব দেয় না। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। “আমরা নিজেদের প্রথমে একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করি। আমরা এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছি, যা আমাদের কাঁচামাল এবং জাজিমের উপাদানগুলো ঠিক কোথায় এবং কী কী এবং কখন তৈরি করতে হবে, তার পূর্বাভাস জানিয়ে দেয়। এর ফলে প্রত্যক গ্রাহকের অর্ডার ট্র্যাক করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

শুরুর দিকে ক্যাসপার মার্কেট সার্ভে করে আরও একটা বিষয় লক্ষ করে। সেটি হলো মানুষ দামি জাজিম কিনতে খুব একটা আগ্রহী নয়। মাটোমুটি একটা হলেই হয়, এমন ভাবনা থেকে লোকের জাজিম

ক্রয়। যে কারণে ৫০০ ডলারের জাজিমের চাহিদা হাজার ডলারের জাজিমের চাহিদার কয়েক গুণ। কাজে শুরুতে তারা কম দামে ভালো জাজিম সরবরাহের চেষ্টা করে এবং সফল হয়। এতে বাজারে তাদের একটা আস্থার জায়গা তৈরি হয়।

ক্যাসপারের সিইও ফিলিপ ক্রিমের ইচ্ছা নাকি যেভাবে ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি রূপান্তরিত হয়েছে, ক্যাসপারও সে রকম ঘুমের রাজ্যকে পরিবর্তন করে ফেলবে। ম্যাট্রেসের পাশাপাশি ওরা অবশ্য এখন চাদর, বেড ফ্রেম ও ক্যাসপার গ্লো ল্যাম্প নামের একটি বেডসাইট বাতিও বের করেছে।

ক্যাসপার এ পর্যন্ত ৩৪০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ জোগাড় করেছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আছেন কারমেলা এনথনি, ফিফটি সেন্ট, এডাম লেভিন, লিওনার্দো দিক্যাপ্রিও ও কেভিন স্পেসি।

শেষ রাউন্ডে এর বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ১.১ বিলিয়ন ডলার। আর সিএনবিসির ‘ডিসরাপ্টর ৫০’ লিস্টের ৮ নম্বরে উঠে এসেছে।

২০২০ সালে ক্যাসপার প্রাথমিক গণপ্রস্তাব দিয়ে এখন শেয়ারবাজারে ঢুকে পড়েছে।
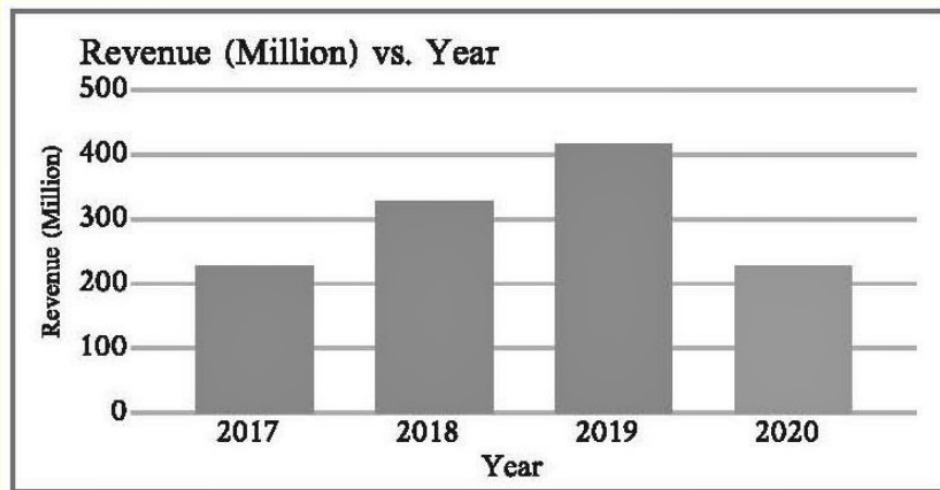
চিত্র ১৪: ক্যাসপারের মোট বার্ষিক আয়

(Statista and Ir.Casper)

ক্যাসপার কেন পারল।

- শুরুতে জাজিমের উপকরণের ওপর ব্যাপক গবেষণা করে প্রচলিত প্রাইস রেঞ্জে ভালো প্রোডাক্ট দিতে পারা। এটি তাদের ক্যাশ ফ্লো তৈরি করার পাশাপাশি বাজারে আস্থাও তৈরি করেছে।
- মার্কেটিংয়ে সেলিব্রিটিদের এনডোর্সমেন্ট। এর ফলে ব্র্যান্ডের নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।
- শুরু থেকে প্রতিটি গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার সংস্কৃতি।
- নন-আইটি প্রোডাক্ট হলেও ব্যবস্থাপনায় আইটির সর্বোচ্চ প্রয়োগ।
- প্রতিনিয়ত প্রোডাক্টের মান উন্নয়নের সঙ্গে গ্রাহকদের যুক্ত করা।

ডিভিডি ভাড়া থেকে ২২০ বিলিয়ন ডলার

১৯৯০-এর দশকে আমি বুয়েট কম্পিউটার সেন্টারে (এখন যেটি আইআইসিটি) প্রোগ্রামারের চাকরি করতাম। সেখানে আমাদের একটা কাজ ছিল বিটিসিএলের টেলেক্স বিল প্রসেস করা। কয়েকটা ম্যাগনেটিক টেপ আসত। সেগুলো আমরা প্রসেস করতাম। এ রকম একটা টেপে ৭০ মেগাবাইট ডেটা থাকত। সে সময় আমাদের মধ্যে একটা চালু জোক ছিল— ৭০ এমবি বুয়েট থেকে গুলিস্তানে টেলেক্স এক্সচেঞ্জে কীভাবে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পাঠানো যায়?

উত্তর হলো, টেপটা হাতে নিয়ে একটা রিকশা দিয়ে গুলিস্তান চলে যাওয়া!!!

ইন্টারনেটের স্পিড এমনই ছিল !

এ কথা মনে পড়ল নেটফ্লিক্স নিয়ে পড়ালেখা করতে গিয়ে। নেটফ্লিক্সের দুই সহপ্রতিষ্ঠাতা তাদের প্রতিষ্ঠান শুরুর নানা গল্প বলে যান। এর মধ্যে রিড হাস্টলিং বার্সেলোনায় ওয়ার্ল্ড মোবাইল কংগ্রেসে বলেন, তিনি একটি স্টেশন ওয়াগন গাড়ি, যা কিনা ম্যাগনেটিক টেপ বহন করে সেটির ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি সম্পর্কে জানতে পারেন। একজন গণিতবিদ নাকি এই অঙ্ক করে দেখান। এ ঘটনা থেকে রিড নাকি চিন্তা করেন একটি ডিভিডি কত ডেটা ধারণ করতে পারে এবং একটা ডিভিডি পাঠাতে পারলেই কত ডেটা পাঠিয়ে দেওয়া যায়। পরে তিনি ভেবেছেন ইন্টারনেট নিশ্চয়ই আরও দ্রুত পাঠাতে পারবে।

তবে রিডের এই গল্পের চেয়ে অ্যাপোলো-১৩ গল্প বেশি আলোচনা পেয়েছে। এটা হলো তখনকার দিনে লোকে সিনেমার ডিভিডি ভাড়া করত ব্লকব্লাস্টার নামের একটি ভিডিওর দোকান থেকে। আমাদের দেশে যেমনটা ছিল সে রকম। তবে ব্লকব্লাস্টার অনেক বড় ব্যাপার ছিল সেই সময়ে। বিশ্বজুড়ে তাদের ডিভিডির দোকান ছিল। সেখানে নির্ধারিত সময়ে ডিভিডি ফেরত না দিলে জরিমানা হতো। রিডের কথিত গল্প হলো অ্যাপোলো-১৩ সিনেমার ডিভিডি ফেরত দিতে দেরি হওয়ায় তার ৪০ ডলার ফাইন হয়। তখন রেগেমেগে তিনি নেটফ্লিক্সের জন্ম দেন।

তবে তার এই দুই গল্পই নাকচ করে দিয়েছেন নেটফ্লিক্সের আরেকজন সহপ্রতিষ্ঠাতা মার্ক রেন্ডলফ। মার্ক নেটফ্লিক্সের জন্ম ও বিকাশ নিয়ে *That will never work* নামের একটা বই লিখেছেন ২০১৯ সালে। সেখানে তিনি বলেছেন, গল্প হিসেবে দুটোই রোমান্টিক, তবে সত্য নয়। বরং তিনি তার বই শুরু করেছেন দুই সহপ্রতিষ্ঠাতার অফিসে যাওয়ার গল্প শুনিয়ে। নেটফ্লিক্সের জন্মের ১৫ মাস আগে থেকে তিনি তার বইয়ের গল্প শুরু করেছেন।

মূল গল্পে যাওয়ার আগে আমরা বরং এই দুই প্রতিষ্ঠাতাকে একটু চিনে নিই। রিড হাস্টলিং ১৯৮৩ সালে বিএ এবং ১৯৮৮ সালে এমএসসি পাস করেন। স্ট্যানফোর্ডে তার এমএসসির বিষয়বস্তু ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (৩২ বছর আগে কিন্তু)। বোঝা যাচ্ছে উনি লাগাতার পড়েননি। বিএ পাস করে তিনি শান্তিমিশনে চলে যান সোয়াজিল্যান্ডে। সেখানে তিনি একটা হাইস্কুলে অঙ্ক করাতেন। ১৯৯১ সালে তিনি পিওর সফটওয়্যার নামের একটি সফটওয়্যার কোম্পানি তৈরি করেন। ১৯৯৫ সালে কোম্পানিটি শেয়ারবাজারে যায় এবং ১৯৯৭ সালে রেশন্যাল সফটওয়্যার সেটিকে কিনে নেয়।

অন্যদিকে মার্ক রেন্ডলফ পড়েছেন ভূতত্ত্বে। তারপর তিনি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, যার সঙ্গে ডাকযোগে মালামাল বিক্রি করার সম্পর্ক ছিল। নেটফ্লিক্সের আগে মার্কের ছয়টা স্টার্টআপের অভিজ্ঞতা আছে।

চিত্র ১৫: নেটফ্লিক্সের সহপ্রতিষ্ঠাতা রিড হাস্টলিং (বাঁয়ে),
মার্ক রেন্ডলফ (ডানে)

তারপর তাদের পরিচয় হয়। কীভাবে?

রিড মার্কের কোম্পানি কিনে নেন এবং কেনার পরে মার্ককে কোম্পানির মার্কেটিংয়ের ভিপি হিসেবে রেখে দেন। এরপর একদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার একটা বিমান সফর তারা একসঙ্গে করেন। তখনই মার্ক খেয়াল করেন, রিডের ব্যবসা বোঝা এবং ব্যবসা অ্যানালাইসিস করার ক্ষমতা অসাধারণ। এর কিছুদিন পরই যথারীতি মার্কের মনে হয় নতুন একটা কোম্পানি করা দরকার। সেটা ১৯৯৭ সাল।

তো, এই সময় তারা দুজন যেহেতু একই অফিসে যেতেন কাজে, তাই তারা গাড়ি শেয়ার করতেন। একদিন রিডের টয়াটো এভালোন। গাড়িতে আর একদিন মার্কের ভলভো গাড়িতে। মার্ক জানিয়েছেন, প্রতিদিনের এই সফরে তিনি একটি নতুন আইডিয়া বলতেন আর রিড সেটি নাকচ করতেন এই বলে, দ্যাট উইল নেভার ওয়ার্ক। তবে আলোচনাটা এখানেই শেষ হতোনা। কারণ, মার্ক যথেষ্ট পড়াশোনা করেই একটি প্ল্যান বলতেন। কিন্তু রিডের থট প্রসেস ছিল যথেষ্ট ফার্স্ট। ফলে তিনি নানা প্রশ্ন করতেন এবং নাকচ করতেন।

মার্ক চাইতেন রিড় তার সঙ্গে নতুন প্রজেক্টে বিনিয়োগকারী বা পার্টনার হিসেবে থাকুক। কাজেই তাকে কনভিন্স করা দরকার। দুজনের মধ্যে একটাই মিল ছিল, সেটি হচ্ছে যা-ই করা হোক না কেন সেটা অবশ্যই ইন্টারনেটভিত্তিক হতে হবে।

এ রকম অনেক ভাবনা-চিন্তার ময়নাতদন্তের পর তারা ঠিক করলেন, তারা ইন্টারনেটে ডিভিডি ভাড়া দেবেন। কারণ, হলো লোকে সিনেমা। দেখেন। যদিও সব জায়গাতেই ব্লকব্লাস্টারের দোকান রয়েছে। এগুলো ডাকযোগে পাঠানো যায়, কারণ ভাঙবে না। তারপরও তারা দুজনের বাসার ঠিকানায় দুটি সিডি মেইল করে দেখলেন, সেগুলো ঠিক থাকে কি না। তারপরই তারা কোম্পানি খুলতে স্থির করলেন।

নাম দেওয়ার সময় তাদের চিন্তা ছিল সহজ। যেহেতু ইন্টারনেট, কাজেই, 'নেট আর সিনেমা বা ফ্লিম থেকে ফ্লিক্স! নেটফ্লিক্স। সিম্পল। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে আত্মপ্রকাশ করল নতুন একটা কোম্পানি।

এমন কোম্পানি যেখান থেকে আপনি ডিভিড়ি ভাড়া করতে পারবেন। ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে লোকে অর্ডার দেবেন, ওরা একটা খামে করে আপনাকে ডিভিডি পাঠিয়ে দেবেন। খামের মধ্যে নেটফ্লিক্সের ঠিকানাসংবলিত একটা খামও থাকে। তার মানে হলো আপনার দেখা হয়ে গেলে আপনি আবার ফিরতি পোস্ট করে দেবেন ডিভিডিটা। ভাড়া কমবেশি ৪ ডলার আর পোস্টাল চার্জ ২ ডলার। সুবিধা হচ্ছে, আপনি যত দিন খুশি বাসায় এটা রেখে যতবার খুশি দেখতে পারবেন। এটা একটি বড় সুবিধা। কারণ, ব্লকব্লাস্টার বা সে রকম দোকান থেকে ভাড়া করলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেখতে পারতেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি হলে লেট ফি বা জরিমানা দেওয়া লাগত। এখানে শুধু একটাই নিয়ম। আগেরটা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত নতুন একটা নিতে পারবেন না। এই সময় কয়েকজন কর্মী ও ১০০০ টাইটেল তাদের ছিল। আর শুরু করার জন্য ২.৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করলেন রিড। দুজনের মাথার মধ্যে কিন্তু আমাজনের চিন্তা ছিল। তারা দুজনই আমাজনের বইয়ের মতোএকটি নিশানা খুঁজে নিতে চেয়েছেন।

আগস্টে কোম্পানি চালু করার পরের বছর ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে নেটফ্লিক্সের ডিভিডি পাঠানো শুরু হয়। দিন যেতে থাকে, তাদের ব্যবসাও বাড়তে থাকে। এই সময়ে তারা ভাবেন ব্যবসার মডেল পরিবর্তন করবেন। তারা প্রতি ডিভিডি ভাড়ার পরিবর্তে গ্রাহকপদ্ধতি প্রচলন করলেন। মানে হলো, আপনি এবার মাসে একটা ফি দিয়ে

সারা মাসে যত খুশি সিনেমা দেখতে পারবেন। এ হচ্ছে পেটচুক্তি খাওয়ার মতোমাসচুক্তি সিনেমা দেখা। রিড আর মার্ক দুজনই এই নতুন ব্যবসার মডেলে খুশি হলেন। তারপর থেকে তাদের গ্রাহক সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। এই সময় তারা জেফ বেজোসের সঙ্গে দেখা করে নেটফ্লিক্স কিনে নিতে তাকে অনুরোধ করেন। জেফ '১৪-১৬ মিলিয়ন ডলার' দিতে রাজি হলেন। মার্কের কাছে এটা যথেষ্ট মনে হলেও রিড কিন্তু রাজি হলেন না। ফিরে এসে তারা তাদের ব্যবসা বাড়াতে মনোযোগ দিলেন।

এই সময় তাদের মনে হলো ব্লকব্লাস্টারের সঙ্গে ঝগড়া করে কী লাভ। বরং তাদের সঙ্গে পার্টনারশিপ করা যাক। ২০০০ সালে রিড প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। নেটফ্লিক্সের জন্য তিনি চাইলেন ৫০ মিলিয়ন ডলার। বিনিময়ে ব্লকব্লাস্টারের অনলাইন হওয়ার কাজটা নেটফ্লিক্স টিম করে দেবে। প্রস্তাব শুনে তির্যক হাসি দিলেন ব্লকব্লাস্টারের সিইও। মিলন হলো না। ২০০২ সালে ছয় লাখ গ্রাহক নিয়ে শেয়ারবাজারে চলে আসে নেটফ্লিক্স। ১৫ ডলারে ৫৫ লাখ শেয়ার ছাড়ে তারা। বছর শেষে তাদের গ্রাহক হয় সাড়ে আট লাখ। তারপর থেকে তাদের গ্রাহক একটা গতিতে বাড়তেই থাকে। পরের বছর ১০ লাখ, ২০০৫ সালে ৫০ লাখ হয়ে যায়। ২০০৭ সালে তারা স্ট্রিমিং সার্ভিস চালু করে 'ওয়াচ নাও' নামে।
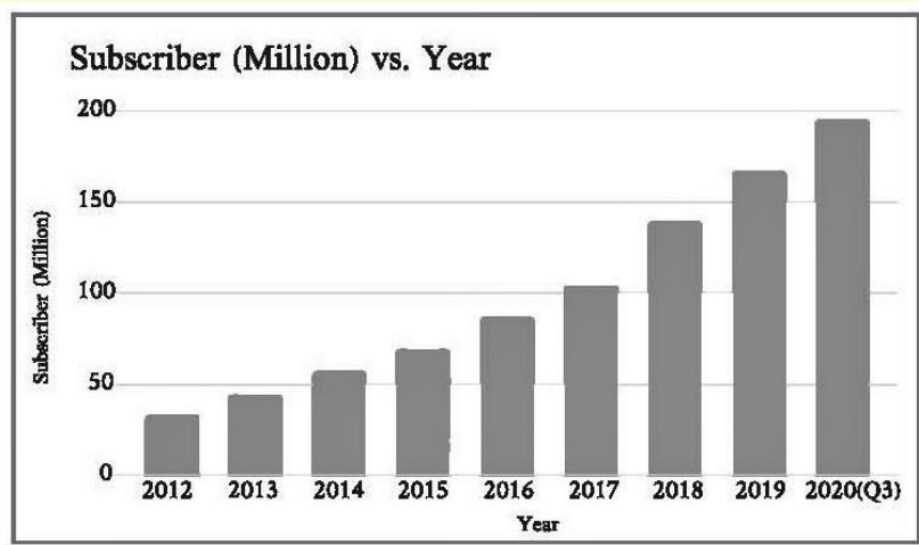
চিত্র ১৬: নেটফ্লিক্সের বার্ষিক গ্রাহকসংখ্যা (Statista)

এখন ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের ১৫% নেটফ্লিক্স খায়। ১৯০টি দেশের ১৫ কোটির বেশি গ্রাহক রয়েছে তাদের। এই লেখা লেখার সময় তাদের মার্কেট ক্যাপিটাল হলো মাত্র ২২০ বিলিয়ন ডলার।

নেটফ্লিক্স নিয়ে আমি একটা ডিটেইল কেস স্টাডি লিখছি, যেখানে ব্লকব্লাস্টারের সঙ্গে নেটফ্লিক্সের বিরোধ ও জয়, স্ট্রিমিং সার্ভিসে আসা এবং সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবসায় উদ্ভাবনী অংশ চালু রাখাকে আমার মতো করে দেখাব। আল্লাহ ভরসা।

দুই বন্ধুর হেসেখেলে ২৫ বিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশে আমাদের সময় বুয়েটে ভর্তি হওয়াটা ছিল সায়েন্সে এইচএসসি পাস করাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ। এখন হয়তোএটা অনেক সহজ। ভারত যেহেতু বড় দেশ এবং তাদের আইআইটিগুলোর সুনাম দেশ ছাড়িয়ে, তাই সেখানে আইআইটির জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাস দেওয়াটা একটা বড় কাজ। শচিন আর বিনি তাই সেই বিচারে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করেছে। যদিও তাদের স্কুলের রেজাল্ট কিন্তু আহামরি নয়।

শচিনের জন্ম চণ্ডীগড়ে, ১৯৮১ সালের ৫ আগস্ট। ব্যবসায়ী বাবার সন্তান শচিনের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছাটা এসেছে পরিবার থেকে। কারণ, ছোটবেলা থেকেই শচিনের কম্পিউটার গেমসের প্রতি আগ্রহ। প্রায়ই ঘরের দরজা বন্ধ করে খেলায় মেতে থাকতেন তিনি। এটা এমন পর্যায়ে গেল যে অনেকেই এটিকে নেশা বলে শনাক্ত করত। এই অভ্যাস তার ভার্সিটিতেও বহাল থাকল। দিল্লি আইআইটিতেও দেখা গেল তিনি সারাক্ষণ কম্পিউটার গেমসে বুদ হয়ে থাকেন। ফলাফল চার বছরে ডিগ্রি শেষ হলো না। অতিরিক্ত এক বছর সেখানে। থাকতে হলো। এই এক বছর সময়কালে শচিনের পরিচয় হলো বিনির সঙ্গে। বিনিও পড়ালেখায় উচ্চমার্গীয় নয়।

বিনিও চণ্ডীগড়ের ছেলে। শচিনের বছরখানেকের ছোট। চণ্ডীগড়ে তাদের দেখা হয়নি কখনো। এমনকি বিনির আইআইটির প্রথম তিন। বছরেও শচিনের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কিন্তু কম্পিউটার গেমস

যখন শচিনকে এক বছর বেশি ক্যাম্পাসে রেখে দিল, তখনই তাদের পরিচয়। গ্রীষ্মের অবকাশে পুরো ক্যাম্পাস খালি হয়ে যায়। কিন্তু বিনি আর শচিন কারও পক্ষে বাড়ি যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, তাদের দুজনেরই ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা হোস্টেলে থাকেন। দেখা গেল, দুজনই একই ল্যাবে গিয়ে কাজ করেন। এ সময় তাদের প্রথম আলাপ। কিন্তু সেটা বন্ধুত্বে রূপ নেয়নি। পাস করার পর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে শচিন ও বিনি চলে আসেন বেঙ্গালুরুতে। শচিন যোগ দেন টেকস্প্যানে আর বিনি সার্নঅব নামের একটা প্রতিষ্ঠানে। এ সময় তাদের যোগাযোগ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

২০০৪ সালে আমাজন তাদের ভারতীয় অফিস খোলার জন্য একটি কঠিন রিক্রুটিংয়ের ব্যবস্থা করে। হেড অফিস থেকে কয়েকজনকে পাঠানো হয়। মোটমাট ৬০ জন মিলে শুরু হয় বেঙ্গালুরুতে আমাজনের অফিস। এ রকম অফিসগুলো ভারতে কেউ আগে দেখেনি। এখানে কেউ স্যুট-টাই পরে অফিসে আসেন না; বরং হাফ প্যান্টের ছড়াছড়ি। সঙ্গে পিকআপ, দামি ক্যাটারারের খাবার, দ্রুতগতির ইন্টারনেট এসব বরং ভারতের টেক-সেবীদের জন্য এটি হয়ে ওঠে আরাধ্যের চাকরি। শচিন যোগ দেন ২০০৬ সালে। আর কয়েক দিন পর বিনিও সেখানে যোগ দেন। এই অফিসে জুনিয়ররা আবিষ্কার করেন, চাইলে সিনিয়রদের কাজের খুঁত ধরা যায়। The Emperor Has No Clothes নামের একটা অনুষ্ঠান সেখানে হতো, যদি কেউ কোনো প্রোডাক্টের ভুল বের করতে পারত। এখানে এভাবে একটা মাইন্ড সেট গড়ে ওঠাদের মধ্যে তিন ডজন সেখান থেকে বের হয়ে নিজেরাই একটা কিছু করার চেষ্টা করেন। আমাদের শচিন ও বিনি বংশালও তাদের দুজন।

চিত্র ১৭: শচিন (বাঁয়ে) ও বিনি (ডানে) ফ্লিপকার্টের প্রতিষ্ঠাতা

সেই সময় একটা ইন্টারনেটভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মোটেই সহজ বিষয় ছিল না। ভারতের মতোএকটি দেশে তখন মাত্র ৫ কোটি লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। মানুষ ভুলেও অনলাইনে কেনাকাটা করেন না। এ রকম অবস্থায় শচিন ও বিনির প্রথম আইডিয়া ছিল, তারা অনলাইনে একটা প্রোডাক্ট রিভিউ সাইট করবেন। এটি হবে ই-কমার্সের সাইটগুলোর একটা হাব। লোকে কেনাকাটা করতে গেলে গুগল করে তাদের সাইটে এসে নির্দিষ্ট প্রোডাক্টের রিভিউ দেখে প্রোডাক্ট সাইটে যাবেন। নির্দিষ্ট সাইটে গিয়ে কেনাকাটা করবেন এবং তারা কমিশন পাবেন। কিন্তু অচিরেই তারা টের পেলেন ভারতের ই-কমার্সে যা পাওয়া যায়, সেগুলো এমনিতে ক্রাপ। যেহেতু অনলাইনে ক্রেতা নেই, কাজেই ভালো মানের প্রোডাক্টও নেই। সেগুলোর রিভিউ করে কী লাভ হবে? 'সবই যখন সাব-স্ট্যান্ডার্ড, তখন সেগুলোকে তুলনা করে কী লাভ। এটাই হলো দুই বংশালের উপলব্ধি।

কাজে সেই চিন্তা বাদ দিয়ে তারা ভাবলেন, নিজেরাই অনলাইনে কিছু বেচবেন। এরই মধ্যে তারা খুঁজে পেয়েছেন বেশির ভাগ ই-কমার্স সাইট আসলে সুন্দর ও কার্যকর নয়। নিজেরাও সেখান থেকে কিছু কিনতে রাজি নন। তাহলে এমন সাইট বানাতে হবে, যা হবে সুন্দর ও কার্যকরী। এই ভাবনা থেকে তারা দুজনই চাকরি ছেড়ে দিলেন। দুজন মিলে চার লাখ রুপিও জোগাড় করলেন। কিন্তু কী বেচবেন?

দুজনই চিন্তা করলেন এমন কিছু বিক্রি করতে হবে, যেটির কোয়ালিটি নিয়ে গ্রাহক প্রশ্ন তুলবে না, দামও দোকান টু দোকান পরিবর্তন হবে না। এমন একটা প্রোডাক্টই তারা এত দিন বিক্রি করেছেন, বই। কাজে তারা ঠিক করলেন, তারা বই বিক্রি করবেন। তারা তোআমাজনের সাফল্য দেখেছেন এবং সেটা ভেতর থেকে। কিছু নিঘুম রাতে জন্ম নিল একটি অনলাইন বুক স্টোর ফ্লিপকার্টডটকম Flipkart.com। যাত্রা শুরু একটি দুই কামরার ফ্ল্যাটবাড়িতে। সেই ফ্ল্যাটটি ছিল বেঙ্গালুরুর কোরামঙ্গলা এলাকায়।

মার্কেটিংয়ের জন্য নিজেরাই বিভিন্ন জায়গায় পোস্টটোস্ট দিতেন। সেই হিসেবে শচিন একটা পোস্ট করে ভি কে কে চন্দ্র নামের একজনের ব্লগে। চন্দ্রই হয় ফ্লিপকার্টের প্রথম কাস্টমার। এ সময় তারা ই-বেতে অ্যাকাউন্ট খুলেও বই বেচেছেন। বইয়ের ওপর ফ্লিপকার্টের স্টিকার লাগিয়ে দিতেন। দুজনই জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, মানে ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার ডেলিভারি তারাই করেছেন। ২০০৭ সালে তারা মোট ২০টি অর্ডার পান। ধীরে ধীরে তারা একটু মোমেন্টাম পেতে শুরু করলেও কেউ কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবেনি ফ্লিপকার্ট একদিন এত বড় হবে। তাদের একজন আইআইটি বন্ধুকে রিক্রুট করতে চাইলে সে বন্ধুটি তাদের বলেছিল- কে আর বই পড়ে?

তারপর তারা বিনিয়োগ খোঁজার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ আগ্রহ দেখায়নি। কেউ কেউ তাদের চাকরির অফার দিয়েছেন। কেউ কম দামে কিনে নিতে চেয়েছে। এই সময় তারা প্রতিদিনই প্রচুর উপদেশ পেতেন। বিশেষ করে আমার মতোএকদল 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল' টাইপের লোক। যারা ভাবে তারা স্টার্টআপের অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। তারা শচিন আর বিনিকে পরামর্শ দিত এসব ছেড়ে চাকরি-বাকরি করতে।

তারা পাত্তা না দিয়ে নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করতেন—

আগামী দিনগুলোতে কি ভারতের অনেক লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করবে?

অনেক অনেক লোক কি একদিন অনলাইনে কেনাকাটা করবে?

অন্য ই-কমার্সগুলোর কী এমন কোনো সমস্যা আছে, যা আমরা সলভ করতে পারি।

এখন আমরা জানি, তাদের প্রশ্নের উত্তর কী ছিল। ই-কমার্সে সব সময়। ঝামেলা হলো বিশ্বাস নিয়ে। তারাও সেটা জানতেন। বইয়ের মতো একটা সহজ এবং কম দামি প্রোডাক্ট দিয়ে ধীরে ধীরে সে জায়গাটা অর্জন করেছেন। তারপর অন্য প্রোডাক্টে মনোনিবেশ করেছেন।

শুরু করার ছয় মাসের মধ্যে ফ্লিপকার্ট লাভের মুখ দেখে। কাজেই ২০০৮ সালে তারা অপারেশন বড় করতে শুরু করে। ২০০৯ সালের আর্থিক বছরে ফ্লিপকার্ট ৪ কোটি রুপির বই অনলাইনে বিক্রি করতে সক্ষম হয়।

বই নিয়ে তাদের কারবার বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২০০৯ সালে এক্সেল সেখানে এক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। তত দিনে ১৫০ জন কর্মী ও তিনটি শহরে অফিস হয়ে গেছে ফ্লিপকার্টের।

চিত্র ১৮: ফ্লিপকার্টের একটি অফিস উদ্বোধনের সময় তাদের কর্মীরা

এত অল্প সময়ের মধ্যে শচিন ও বিনিও নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ করে যেতে থাকেন। শচিন হলেন ভিশনের লোক। দূর দেখতে পাওয়াটা তার কাজ। আর একটু শরমিন্দা কিসিমের বিনি একজন পিওর টেকনিক্যাল লোক। তার কাজ হলো কারিগরি ব্যাপারটা দেখা। ফলে তাদের দুজনের মধ্যে কখনো ঝগড়া হয়নি। দুজনের ক্ষেত্র আলাদা।

এর মধ্যে ভারতের ই-কমার্স সেক্টর একটু একটু করে মনোযোগ আকর্ষণ শুরু করে। ২০১০ সালে শচিন ও বিনি ১০ মিলিয়ন ডলার। বিনিয়োগ পান টাইগার গ্লোবাল থেকে।

এরই মধ্যে বই বিক্রি করে তাদের সুনাম হয়েছে। নতুন বিনিয়োগ পেয়ে তারা অন্য খাতেও যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু করে মোবাইল বিক্রি। কিন্তু দেখা গেল, যারা বই কেনেন বা অনলাইনে কেনাকাটা করেন, তারা মোটেও মোবাইল কিনতে আগ্রহী নন। কারণ, ই-কমার্সে কেনাকাটাকে রিস্ক মনে করেন লোকে। কাজে তারা ৫০০ টাকার বইয়ের ওপর রিস্ক নিলেও ১০ হাজার টাকার মোবাইলে সেটা নিতে আগ্রহী হলো না।

ব্যাপারটা খেয়াল করে ফ্লিপকার্ট চালু করে 'ক্যাশ অন ডেলিভারি' সিস্টেম। মানে জিনিস বুঝে নিয়ে বিল দেওয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়। 'বিনা প্রশ্নে ফেরত নেওয়া' ফিচার। মানে কেউ যদি অর্ডার দিয়ে ডেলিভারির সময় নিতে না চান, তাহলে কোনো প্রশ্ন না করে সেটি ফেরত নিয়ে আসা। এরপর তারা বদলে দেওয়ার নীতিরও প্রচলন। করেন। এসব বুদ্ধি তাদের বিক্রি বাড়িয়ে দেয় অনেক।

২০১২ সালে আমাজন আবার ইন্ডিয়ায় এসে পড়ে। তখন থেকে ফ্লিপকার্ট জানত, সামনে তাদের লড়াই কঠিন। কাজে তারা ভাবতে থাকে আমাজনের মতোবড় কোম্পানির বিনিয়োগের সঙ্গে পারাটা কঠিন। হবে। কাজে তারাও বড় বিনিয়োগকারী খুঁজতে থাকে। ২০১৮ সালে ফ্লিপকার্টের একটা বড় অংশ ১৬ বিলিয়ন ডলারে ওয়ালমার্টের কাছে বেচে দেয়। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স অধিগ্রহণ হিসেবে বিবেচিত। ওয়ালমার্ট যদিও আমেরিকার অন্যতম খুচরা বিক্রেতা। কিন্তু এর অনলাইন বিক্রির পরিমাণ মোট বিক্রির মাত্র ৩ শতাংশ। অন্যদিকে ২০০৭ সালে শুরু হওয়া ফ্লিপকার্ট ভারতের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স সাইট, যার অন্যতম বিনিয়োগ এসেছে মাইক্রোসফট, টেনসেন্ট ও সফটব্যাংকের মতোবিনিয়োগকারী থেকে। ওয়ালমার্ট চিন্তা করেছে কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের ইন্টারনেট বাজার ২০০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যেতে পারে।
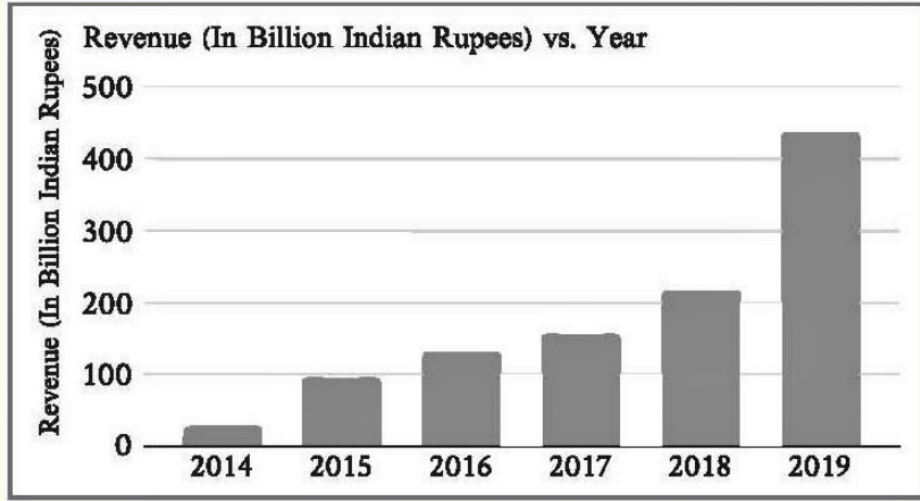
চিত্র ১৯: ২০১৪-২০১৯ পর্যন্ত ফ্লিপকার্টের বার্ষিক আয় (Statista)

সেখানে নতুন করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার বদলে বিশ্বস্ত কোনো প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নেওয়াই ভালো। ভারতে ওয়ালমার্টের ২১টি পাইকারি বিক্রয়-সেন্টার আছে, কিন্তু অনলাইন খুচরা বিক্রির মার্কেটে এর কোনো উপস্থিতি নেই। এই বিনিয়োগ ১০ কোটি খুচরা ক্রেতার এই মার্কেটে নিজেকে জানান দিতে ওয়ালমার্টকে সাহায্য করবে। এ ছাড়া এই চুক্তি ভারতের বাজারে আমাজন ও ওয়ালমার্টের বাজার দখলের যুদ্ধকে আরও একধাপ ওপরে নিয়ে যাবে।

ওয়ালমার্টের পর ২০১৯ সালেও তারা তাদের আরও শেয়ার বেচে দিয়েছে।

এখন এই দুই বংশালের ‘বই কে পড়ে’ দোকানের মূল্যমান হয়েছে। মাত্র ২৪.৯ বিলিয়ন ডলার। তারা দুজনই বিলিওনিয়ার এবং নানা কিছু এখন করে বেড়ান।

বংশালদের কাছ থেকে শেখা

- সম্পর্ক যেভাবে হোক না কেন, সময়মতোসেটিকে ঝালিয়ে নিতে হবে। যদি চিন্তার মিল থাকে, তাহলে তোবটেই।

- কয়েকজন মিলে উদ্যোগ শুরু করতে পারলে ভালো হয়। পার্টনারদের মধ্যে কমপ্লিমেন্টারি স্কিল থাকলে সেই পার্টনারশিপ

টেকসই হয়। বিনির ছিল টেকনিক্যাল স্কিল। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও শচিন কিন্তু বিনির টেকনিক্যাল কাজে হস্তক্ষেপ করেননি।

- মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট ও প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট সম্পর্কে ধারণা। তাদের প্রথম উদ্যোগ, ই-কমার্সের রিভিউ সাইট নিয়ে তারা কিন্তু এক্সাইটেড হননি। এটি বাদ দেওয়ার জন্য নিজেদের সাইটের চেয়ে ই-কমার্সের মূল ব্যাপারটাই বেশি দেখতে পেয়েছেন। তারা দেখেছেন, ই-কমার্সে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট নেই। কাজে রিভিউ দেখে কেনাকাটার লোক কই পাওয়া যাবে?

- একটি নিশ এরিয়া নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। বই বেছে নেওয়ার কারণ হলো বইয়ের দাম সারা দেশে একই। বইয়ের দাম নিয়ে লোকে দামাদামি করে না। তা ছাড়া বইয়ের কোয়ালিটি নিয়ে তেমন একটা গালমন্দ বই বিক্রেতাকে খেতে হয় না।

- সময়মতোক্যাশ অন ডেলিভারি, ‘আন কোশ্চেনস রিফান্ড’ এবং রিপ্লেসমেন্ট পলিসি চালু করা।

- আমাজনের মতোবড় প্লেয়ারের সঙ্গে বেশি দিন লড়াই না করে সময়মতো নিজেদের স্টেক বিক্রি করে ভারমুক্ত হওয়া।

টয়লেট ক্লিনিং থেকে বিলিওনিয়ার

আমাদের মাইন্ডসেট এখন এমন, যেকোনো ব্যবসায়িক বড় সাফল্যের কথা শুনলে আমরা ভেবে বসি আইটির কথা। এর কারণও আছে। ২০০৬ সালেও বিশ্বের সবচেয়ে দামি কোম্পানির মধ্যে এক্সনমোবিল, জেনারেল ইলেকট্রিক ছিল। কিন্তু এখন আমাজন, অ্যাপল, মাইক্রোসফট, গুগল হলো বিশ্বের প্রথম চারটি কোম্পানি, মার্কেট ক্যাপিটাল হিসাবে।

কাজে আমি যে দুই ভাইয়ের কথা লেখার জন্য আজকে কি-বোর্ডে বসেছি, তাদের কথা আমি মাত্র সপ্তাহখানেক আগে মিডিয়ামে পড়েছি। এখানে (চিত্র ২০ দ্রষ্টব্য) দুই ভাইয়ের হাস্যোজ্জ্বল ছবি দেওয়া, অ্যাওয়ার্ড হাতে। উত্তর ইংল্যান্ডের এই দুই ভাইয়ের প্রত্যেকের সম্পদের পরিমাণ এখন ৪ বিলিয়ন ডলার (৪০০ কোটি ডলার)! দুই ভাইকে বলা হয় ঈসা ভ্রাতৃদ্বয়— মোহসিন ও যুবের ঈসা! তাদের গ্রুপের নাম ইজি গ্রুপ।

চিত্র ২০: ইজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মোহসিন ঈসা (বাঁয়ে) ও যুবের ঈসা (ডানে)

উত্তর ইংল্যান্ডের স্ল্যাকবার্ন নামের একটি শহরে তারা বড় হয়েছেন। ২০১৯ সালে এই শহর যুক্তরাজ্যের বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় সাফল্যের সঙ্গে ১০ম স্থান অধিকার করে। দুই ভাই কখনো ভার্সিটিতে পড়তে যাননি। কিশোর বয়সে তাদের বাবা একটি পেট্রলস্টেশন (পাম্প) খরিদ করেন। দুই ভাই সেখানেই কাজ করতে শুরু করেন।

বাবার স্টেশনে তারা কঠিন পরিশ্রম করতে শুরু করেন। সারা দিন একটা পেট্রলস্টেশনে যা যা কাজ থাকতে পারে, তার সবই তারা করেছেন। দুই ভাইয়ের নিয়মিত কাজ ছিল পেট্রলস্টেশনের টয়লেট ক্লিন করা। শার্টের হাতা গুটিয়ে তারা এই কাজটা করেছেন। করেছেন। বলে তারা দুজন ব্যবসাটার খুঁটিনাটি টের পেতে শুরু করেন এবং তখন থেকে তারা প্ল্যান করেন নিজেদের স্টেশনের। তারপর তারা। সেখানে এক্সট্রা আওয়ার কাজ করতে শুরু করেন। টার্গেট টাকা আয় করে জমানো। কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করে তারা মোট দুই লাখ ডলারের একটা সঞ্চয় গড়ে তোলেন। তারপর ২০০১ সালে সব জমানো টাকা দিয়ে নিজেদের প্রথম স্টেশন তারা স্থাপন করেন।

অচিরেই তারা কয়েকটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেন। প্রথমত, যারা পেট্রল স্টেশনে ফুয়েল নিতে আসেন, তাদের অনেক তাড়া

থাকে। এর মানে হলো, তারা যদি সেখানে কেনাকাটা করেন, তাহলে ওই বেচাতে অনেক মার্জিন করা যায়। দ্বিতীয়ত, পাম্পে সম্ভাব্য সব জ্বালানি রাখা। তারা রাখতে শুরু করেন এসো, বিপি, শেল ও টেক্সাকো ব্র্যান্ডের ফুয়েল। আর তারা পেট্রল স্টেশনে প্রচুর বাতি লাগিয়ে সেটির রাতকেও দিন করে ফেলেন। ফলে তাদের পাম্পগুলো হয়ে ওঠে নিরাপদ। লোকের আস্থা তাদের দিকে ফিরতে শুরু করে। কাজে তারা প্রফিট করতে থাকেন, তাদের এই ছোট্ট আইডিয়া কাজে লাগে এবং ব্যাংক ও তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করে। কাজে তারা দ্রুত আরও পাম্প একোয়ার করেন এবং সেখানে নিজেদের আইডিয়া বাস্তবায়ন করতে শুরু করেন। যখন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পাম্পের মালিকানা তাদের হাতে আসে, তখন তারা পরের ধাপে যেতে শুরু করেন।

তারা বুঝতে পারেন, তাদের পেট্রল পাম্পের দোকানটা তাদের বড়লোক করবে, তবে বিলিওনিয়ার করবে না। এর সঙ্গে কিছু একটা অ্যাড করতে হবে। প্রথমত, তারা দেখলেন, তাদের স্টেশনগুলোতে তারা বড় কোম্পানিগুলোর বিলবোর্ড বসাতে দিতে পারেন। যেহেতু লোকে শুধু তাদের অতিক্রম করে যায় না, সেখানে থামে। কাজেই তাদের বিলবোর্ডগুলোর জন্য প্রিমিয়ার চার্জ করা সম্ভব। অন্যদিকে ওরা স্টারবাকস বা কেএফসিকে বলতে শুরু করলেন আমাদের পাম্পে আসো, তোমার একটি শপ খোলো। তাদের হিসাব সোজা।

কেএফসি, স্টারবাকসের দোকান থাকলে লোকে তেল কেনার পর সেখানে থামার তাড়না বোধ করবে। আর একবার কফি খেতে নামলেই তাকে অনেক কিছু গছিয়ে দেওয়া যাবে। শুরুর দিকে এই পার্টনারশিপটা সহজ ছিল না। কিন্তু অচিরেই তারা কেএফসি, স্পার, ক্যারিফোর, লুইজ দেলহেইজ, স্টারবাকস, গ্রেগস, বার্গার কিং ও সাবওয়ের সঙ্গে পার্টনারশিপ করতে সক্ষম হয়েছে।

লং স্টোরি শর্ট— দুই ভাইয়ের শুরু করা সাম্রাজ্য বড় হতে শুরু করলে সেখানে হাজির হয় ইউরো গ্যারাজ অ্যান্ড ইএফআর গ্রুপ, টাকাপয়সা নিয়ে। এখন ইউরোপ ও আমেরিকার ১০টি দেশে তাদের

মালিকানাধীন পাম্পের সংখ্যা, উইকিপিডিয়ার হিসাবে, ৫ হাজার ৮৬৬টি। ২০১৯ সালে তাদের রেভিনিউ ২০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে!!!
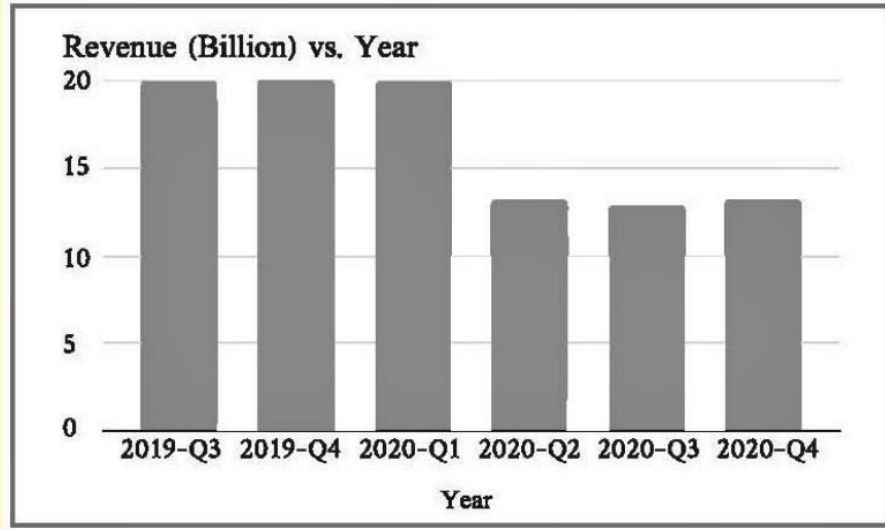
চিত্র ২১: ইজি গ্রুপের বার্ষিক মোট আয়, ২০১৯ সালের তৃতীয় ভাগ হতে ২০২০ সালের ৪র্থ ভাগ পর্যন্ত (www.zoominfo.com)

ঈসি ভাইদের গল্প থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। তবে সবচেয়ে বড় শেখাটা হলো একটা ব্যবসার একেবারে ভেতরের বিষয় যদি জানা থাকে, তাহলে এগিয়ে যাওয়াটা সহজ হয়। সে জানার জন্য দরকার হলে বাথরুমও ক্লিন করতে হবে (নলেজ অব দ্য ইন্ডাস্ট্রি)। উদ্ভাবনী চিন্তা (আমাদের জায়গায় আপনার দোকান দিন), রিস্ক (জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে প্রথম স্টেশন কেনা), ব্যাংককে কনফাইন্ড করে দ্রুত এক্সপান্ড করা এবং গ্রোথ হ্যাকিং টেকনিক ব্যবহার করা! আরও কিছু হয়তোশেখার আছে।

বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপ ও ৭৫

খালি পায়ের বিলিওনিয়ার শিক্ষক

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি গ্রাম। নিকটতম শহর থেকে ২০-৩০ কিমি দূরে। আপনি যখন সেখানে পৌঁছাবেন, ততক্ষণে গ্রামের স্কুলের ক্লাস ছুটি হয়েছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত ভদ্রলোককে আপনি হয়তোস্কুলের সামনে খেতের মধ্যে পাবেন। আপনার ডাক শুনে সাইকেল ওয়ালা ভদ্রলোক দাঁড়াবেন। উনি গ্রামের স্কুলে গণিত আর বিজ্ঞান পড়ান। স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাদের এই নতুন শিক্ষককে পছন্দ করে। কারণ, তার পড়ানোর স্টাইলটা ভিন্ন। আপনি তাকে ধুতি আর শার্ট পরা দেখে মনে মনে খুশি হবেন। কারণ, আপনি শুনে এসেছেন তার প্রিয় পোশাক হচ্ছে টি-শার্ট, জিনস ও স্যান্ডেল। তবে অনেক সময় থাকেন খালি পায়ে। ইনফ্যাক্ট তাকে জুতা পরা কেউ দেখেছে কি না, সেটা বলা মুশকিল।

ভদ্রলোকের সোজা কথা— 'I live fairly simply, I hate wearing shoes. If I can avoid it, I do.'

এই নাঙ্গা পায়ের ভদ্রলোক একটি নতুন মিশন নিয়ে নেমেছেন। আমার মনে হয়, ভদ্রলোকের পরিচয় আমি দিয়ে দিতে পারি এ বেলায়। ফোর্বস ম্যাগাজিনের হিসাবে, ভদ্রলোকের সম্পদের পরিমাণ মাত্র ১৬০ কোটি ডলার। ভদ্রলোকের নাম শ্রীধর ভেম্বু। নাঙ্গা পায়ের বিলিওনিয়ার !!!
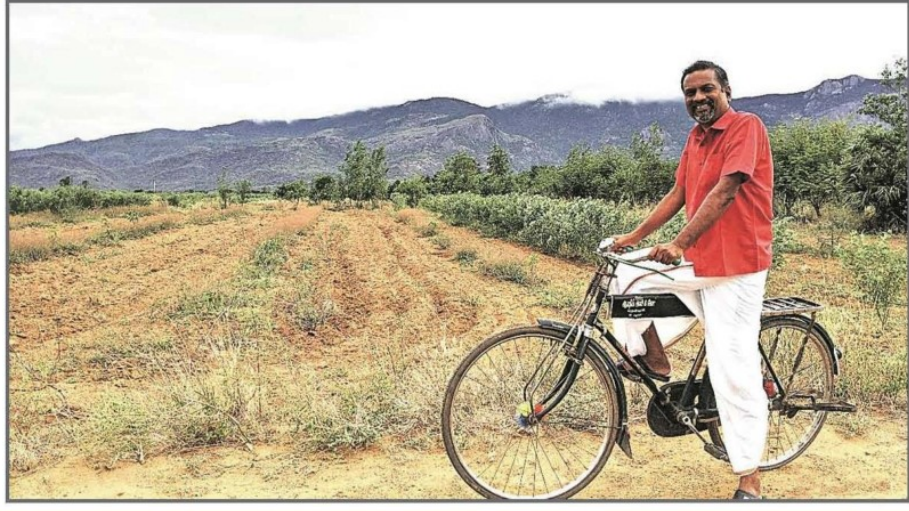
চিত্র ২২: সাইকেলে বসে থাকা ভদ্রলোকটি জোহোর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীধর

তামিলনাড় গ্রামের এক্সপেরিমেন্টের আগে বরং আমরা তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিই। চেন্নাই হাইকোর্টের স্টেনোগ্রাফার বাবা ও গৃহবধূ মায়ের সন্তান শ্রীধর। জন্ম ১৯৬৭ সালে। সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ালেখা শুরু করে শ্রীধর শেষ পর্যন্ত পৌঁছান আইআইটি মাদ্রাজে। আইআইটি বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সুনাম এখন বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে টেকনোলজি ফিল্ডে। ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর এমএস আর পিএইচডি করার জন্য আইনস্টাইনের ইউনিভার্সিটি প্রিন্সটনে। সেখান থেকে পিএইচডি করে বের হলেন ১৯৯৪ সালে। লেকচারারের অফার পেলেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ক্যানবেরায়। কিন্তু চাকরি নিলেন কোয়ালকমে, সান ডিয়াগোতে। যদিও প্রফেসর হওয়ার ইচ্ছাতেই তিনি এমএস আর পিএইচডি করেছেন কিন্তু তত দিনে টের পেয়েছেন পড়ানো আর গবেষণার চেয়ে মাঠের হাতেকলমে কাজ করতেই তার বেশি ইচ্ছা ও আগ্রহ। কাজে চাকরিতে ঢোকা।

সেখানে তড়িৎকৌশলী হিসেবে তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ওয়্যারলেস যোগাযোগ, সিডিএমএ ও পাওয়ার কন্ট্রোল। এই সময় অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও তার আগ্রহ জন্মে। এই সময় শ্রীধর একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় খেয়াল করেন। তিনি লক্ষ করেন সিলিকন ভ্যালিসহ বিশ্বের তাবৎ দেশে ভারতীয়রা সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে কাজ

করছেন। কেউ কেউ উচ্চ পদেও। কিন্তু ভারতের নিজস্ব কোনো সফটওয়্যার প্রোডাক্ট নেই। তিনি ভাবলেন সফটওয়্যার বানানো যাক।

১৯৯৬ সালে চেন্নাইয়ের একটি অ্যাপার্টমেন্টে এডভেন্টনেট নামের একটি সফটওয়্যার কোম্পানি চালু করেন। ভাই আর সিনিয়র একজন বন্ধুকে সঙ্গে নেন। বন্ধু টনি টমাস হলেন কোম্পানির চেয়ারম্যান ও শীর্ষ নির্বাহী। শ্রীধর নিজে হলেন এভেনজেলিস্ট। নিজের ভাগে রাখলেন মার্কেটিংয়ের কাজ। শুরু থেকেই তারা বেশ ভালো সাড়া পান। এর মধ্যে সিসকো করপোরেশন ও তাদের ক্লায়েন্ট হয়। ২০০০ সালের মধ্যে টিমে ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ১২০ পার হয়ে যায়। তত দিনে আমেরিকায়ও অফিস হয়েছে তাদের। আর বার্ষিক আয় দাঁড়ায় ১০ মিলিয়ন ডলারে।

কিন্তু তারপরই ডটকম পতন শুরু হয়। টম কোম্পানি ছেড়ে চলে যায়। শ্রীধর কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহীর দায়িত্ব নেন। অন্যান্য কোম্পানির পতন দেখে তিনি ভয় পেলেন না। বরং ভাবলেন মডেল চেঞ্জ করতে হবে। তখন থেকে তারা বিটুবি সার্ভিসের দিকে নজর দিতে শুরু করেন। আইডিয়াটা এমন যে তাদের সফটওয়্যারগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ ও ডেভেলপমেন্টের কাজটা তারা করতে থাকবেন। এতে কোম্পানির লাভ হবে। বহুবিধ কারণে নতুন সফটওয়্যার না কিনেও তারা আপডেট পাবে আর সফটওয়্যার চালু আছে কি না, সেটা নিয়ে টেনশনও করতে হবে না।

এ সময় শ্রীধর ইঞ্জিনিয়ারদের তার দীর্ঘদিনের স্বপ্নের জন্য কাজে নামিয়ে দেন। এটি হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার। একটি সফটওয়্যার প্যাকেজের আওতায় থাকবে অনেক অনেক মডিউল এবং যার যা লাগবে, সেটি নিয়েই ব্যবহার করতে পারবেন। এভাবেই ২০০৫ সালে জোহো (ZOHO) সফটওয়্যারের জন্ম হয়। এর মডিউলগুলোর কয়েকটি হলো সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, এইচআর অ্যান্ড ফিন্যান্স, ই-মেইল অ্যান্ড কোলাবোরেশন, আইটি ও হেল্পডেস্ক। ২০০৯ সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে জোহো করপোরেশন করা হয়। খালি পায়ের শ্রীধর ও তার ফ্যামিলি জোহো

করপোরেশনের ৮৮%-এর মালিক, যার পরিমাণ আগেই বলেছি ১.৬ বিলিয়ন ডলার। জোহোর টার্নওভার বছরে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি।
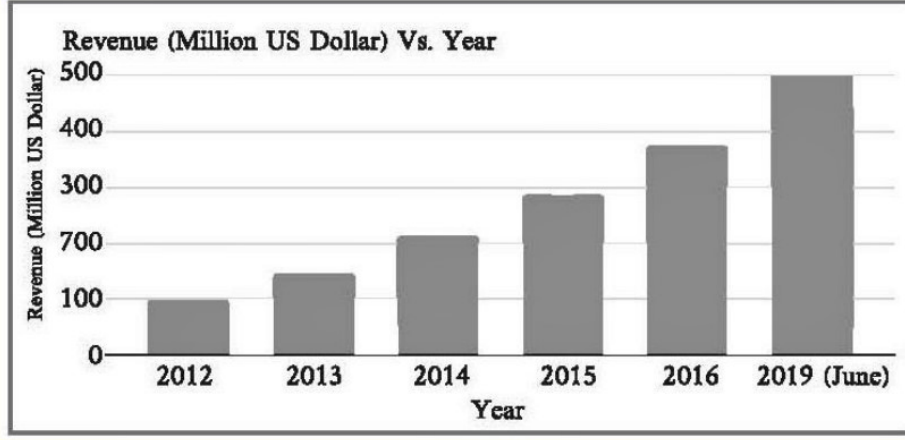
চিত্র ২৩: জোহো করপোরেশনের বার্ষিক মোট আয় ২০১২-২০১৯ (জুন) পর্যন্ত (www.themarketingstudent.com)

৫৩ বছর বয়স্ক শ্রীধর এখন পর্যন্ত কোনো ফান্ডিং নেননি কিংবা কোম্পানির কোনো অংশ বিক্রিও করেননি। আমার ধারণা, এই কারণে তার সম্পর্কে আমরা খুব একটা বেশি জানি না। লাভের টাকা আমরা বিনিয়োগ করি, আবার বিনিয়োগ করি। শ্রীধর বলছিলেন, একজন অস্ট্রেলীয় সাংবাদিককে।

শুরু থেকে আমরা ব্যাংকে কত টাকা থাকল, সেটা নিয়ে ভাবিনি। বরং চেষ্টা করেছি এমন কিছু করতে, যা করে আমরা আনন্দ পাই। যদিও একটা ধারণা হলো স্টার্টআপ করা হয় এক্সিটের জন্য। কিন্তু আমি যদি আমার কাজটা আনন্দের সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গেই করি, তাহলে কেন এক্সিট করব?', শ্রীধরের সরল জিজ্ঞাসা। এই চিন্তাটা কিন্তু মারাত্মক। কারণ, আইটি ইন্ডাস্ট্রিজুড়ে আপনি দেখবেন ভেঞ্চারের পেছনে দৌড়ানো এবং প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে (IPO) গিয়ে নিজেদের ইউনিকর্ন হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা। শ্রীধর কিন্তু এ রাস্তায় হাঁটলেন না।

চিত্র ২৪: জোহো করপোরেশনের হেডকোয়ার্টার, চেন্নাই, ভারত

কয়েক বছর আগে জোহা তার কর্মীদের ওপর একটি সার্ভে করে। দেখা গেল, ৪০% বা ৩৫০০ জন কর্মী বলেছেন, তারা বাড়ির কাছে থাকতে পারলে খুশি হতেন। এবারের অতিমারি শ্রীধরকে এই চিন্তাটাই বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছে। তামিলনাড়ুর ২০টি গ্রামে এখন ২০০ প্রকৌশলী তাদের বাড়ির কাছে কাজ করছেন। শ্রীধর ভাবছেন, এটিকেই তিনি মডেল করবেন। কারণ, তিনি মনে করেন— গ্রামের লোকেরাও শহরের লোকদের মতোসমান দক্ষ এবং ভালো কাজ করতে পারেন। জোহো স্যুটে এখন ৪০টির মতোঅ্যাপ আছে, যা ছোট ব্যবসা থেকে বড় ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগে। জোহোর এখন প্রায় ৫ কোটি ব্যবহারকারী আছে। শ্রীধরের ইচ্ছা, ব্যবসা পরিচালনার সব সফটওয়্যার জোহোর থাকবে এবং কর্মীপ্রতি মাত্র ১ ডলারে সেটা উদ্যোক্তারা ব্যবহার করতে পারবেন।

হোয়াটসঅ্যাপের গল্প

মেঝে মোছা থেকে ১৯ বিলিয়ন ডলার

ফেব্রুয়ারি ২০১৪। তিনজন লোককে দেখা গেল সিলিকন ভ্যালির মাউনটেইন ভিউ শহরের রেললাইনের পাশে একটি সাদা বিল্ডিংয়ের সামনে জড়ো হতে। দুই দশক আগে সেখানেই নর্থ কাউন্টির সোশ্যাল সার্ভিস অফিস ছিল। সেখানেই লাইনে দাঁড়িয়ে একসময় খাবার সংগ্রহ করতেন ইউক্রেন থেকে আসা এক কিশোর, তিনজনের একজন। এই সোশ্যাল সার্ভিস অফিসটি তাদের ৫৫ জনের অফিস থেকে সামান্য দূরেই। কিছুক্ষণ পরই হাজির হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। কথাবার্তা আগেই ঠিক ছিল। ফেসবুকের প্রতিনিধিদের সাইন করা চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন ৩৮ বছর বয়সী ইউক্রেনীয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দরজার ওপরে কাগজ রেখে সেখানে স্বাক্ষর করে ফেললেন। চুক্তিতে লেখা হয়ে গেল তার স্বাক্ষর জ্যান কৌম। আর এভাবে মাত্র ১৯.৬ বিলিয়ন ডলারে ফেসবুকের অংশ হয়ে গেলে সেই সময়কার উঠতি জনপ্রিয় মেসেজিং সার্ভিস হোয়াটসঅ্যাপ!!! ১৯.৬ বিলিয়ন ডলার কত টাকা? সেদিনের হিসাবে বাংলাদেশি টাকায় মাত্র ১ লাখ ৬৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা! আমাদের ২০২০ সালের জাতীয় বাজেটের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ! যেদিন এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়, সেদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ছিল ২০ বিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি।

চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্যান কৌম *ফোর্বস* ম্যাগাজিনের নিয়মিত বিলিওনিয়ারের (১০০ কোটি ডলার সম্পদ আছে এমন ব্যক্তি) তালিকায় ঢুকে যান ৭.৫ বিলিয়ন ডলার নিয়ে। ২০২০-এর আগস্টে তার সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ বিলিয়ন ডলারে।

সেই সময়কালের সবচেয়ে দামি অ্যাপ কেমন করে বানাল এই ইউক্রেনীয়?

জ্যান কৌমের জন্ম ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের বাইরের একটা গ্রামে। ইহুদি ধর্মাবলম্বী। বাবা নির্মাণশ্রমিক, মা গৃহবধূ। ওই গ্রামেই কৌমের বেড়ে ওঠা। যে বাসায় তারা থাকতেন, সেখানে কোনো গরম পানির সুবিধা ছিল না। ওর বাবা বা মা কালেভদ্রে ফোনে কথা বলতেন। কারণ, ধারণা করা হতোসরকার ফোনে আড়ি পাততে পারে। কিন্তু সেখানকার জীবনটা অনেক সুন্দর আর শান্তির ছিল বলে মনে করেন কৌম।

চিত্র ২৫: হোয়াটসঅ্যাপের প্রতিষ্ঠাতা জ্যান কৌম

বাচার জন্য মেঝে মোছা

১৬ বছর বয়সে কৌম তার মা আর দাদির সঙ্গে মাইগ্রেট করে চলে আসেন আমেরিকার মাউনটেইন ভিউতে। একটি সোশ্যাল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য একটি দুই রুমের বাসার ব্যবস্থা করে দেয়। কথা ছিল কৌমের বাবা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু তার

বাবা কখনো আমেরিকাতে আসতে পারেননি। বাড়ি থেকে আসার সময় কৌমের মা স্যুটকেসে করে ২০টি সোভিয়েত নোটবুক (খাতা) নেন যেন কৌমের জন্য স্কুলের খাতা কিনতে বাড়তি টাকা না লাগে। মাউনটেইন ভিউতে কৌমের মা বেবি সিটিংয়ের কাজ নিলেন। আর কৌম একটা গ্রোসারি স্টোরের সুইপারের কাজ। মূল কাজ মেঝে মোছা। এভাবেই মা-ছেলের জীবন চলে।

কৌমের ইংরেজির দখল ভালো ছিল আর ছিল পড়ার আগ্রহ। স্কুলে খুব একটা সুবিধা করতে না পারলেও ১৮ বছরের মধ্যে কৌম কিন্তু কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের বেশ কিছু বিষয় রপ্ত করে ফেলেন। এই কাজ তিনি করেছেন পুরাতন বই পড়ে, যেগুলো তিনি পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে কিনতেন। পড়া শেষ হলে সেগুলো আবার ওই দোকানে বিক্রি করে দিতেন। সেই সময় কৌম সেন্ট জোসে স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন। একই সময়ে আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের হয়ে সিকিউরিটি টেস্টারের কাজও পেলেন। আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং থেকে সুযোগ পেলেন দলবলসহ ইয়াতুতে কাজ করার। ইয়াহুর বিজ্ঞাপন সিস্টেম দেখাটা ছিল তাদের কাজ। আর দশ জন ইন্টার্নের তুলনায় কৌম ছিল ভিন্ন। ইয়াহুর ৪৪ নম্বর কর্মী এক্টনের পাশে একটা টেবিলে বসে কৌম তার কাজ করতেন। কৌতুহলী এক্টন দেখলেন। কৌমের প্রশ্নগুলো ভিন্ন; এ বিষয়ে তোমাদের পলিসি কী? তুমি সারা দিন কী করো? যেকোনো কিছুর গভীরে যাওয়ার তার এই এটিচ্যুডটাই এক্টনের পছন্দ হয়। ছয় মাস পড়েই ইন্টারভিউ দিয়ে। ইয়াহুতে অবকাঠামো প্রকৌশলী হিসেবে চাকরি হয়ে যায় কৌমের। ১৯৯৭ সালে ইয়াহুতে চাকরি পাওয়া যেকোনো যুবকের জন্যই ছিল বড় ব্যাপার। তখনো কৌম তার পড়াশোনা ছাড়েননি। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর ইয়াহুর একটি সার্ভারে সমস্যা হলে ইয়াহুর সহপ্রতিষ্ঠাতা ডেভিড ফিলো কৌমকে ফোন দিয়ে জানতে পারেন তিনি ক্লাসে। ক্লাসে কী করো, সত্বর অফিসে আসো। কৌম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই ছেড়ে দিল। ২০০০ সালে কৌমের মা মারা যান ক্যানসারে। এর আগে ১৯৯৭ সালে ইউক্রেনে মারা যান তার বাবা। এ সময় এক্টনের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। তারা দুজনই সময় পেলে ফ্রিজবি খেলতেন।

‘৯ বছরের জেল!

ইয়াহূতে ৯ বছর কাটিয়েছেন কৌম। কিন্তু সে অর্থে উপভোগ করেননি নিজের কাজ। ইয়াহুতে চাকরির সময়কালকে জ্যান কৌম মনে করেন জেলখানায় থাকার সমতুল্য। বলতেন, “আই ডিড নাইন ইয়ার্স ইন ইয়াহু। এখন না থাকলেও একসময় তার লিংকডইন প্রোফাইল ছিল। ইয়াহুর শেষ তিন বছরে সেখানে লেখা কিছু কাজ করেছি (ডিড সাম ওয়ার্ক)। এই ৯ বছরে এক্টন ও কৌম ইয়াহুর অনেক উত্থান-পতন দেখেছেন। কিন্তু মন আর বসেনি। এক্টন এই সময়ে বেশ কিছু নতুন স্টার্টআপে বিনিয়োগ করেছেন, কিন্তু প্রায় সবটাতেই তার বিনিয়োগ মাঠে মারা গেছে।

এভাবে আর কত দিন। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৌম ও এক্টন, দুজনেই ইয়াহুর চাকরি ছেড়ে দেন। এই ৯ বছরে কিপ্টা কৌম প্রায় ৪ লাখ ডলার সঞ্চয় করেছেন। ওই টাকা নিয়ে তারা দুজন বের হয়ে পড়েন লাতিন আমেরিকায় ঘুরে বেড়াতে।

ঘুরে বেড়ানোর হ্যাপা

আমি যখন প্রথমবার মালয়েশিয়া যাই, সেবারই প্রথম আবিষ্কার করি, বিদেশ থেকে দেশে ফোন করার নানান তরিকা আছে। প্রথম তরিকা হলো সরাসরি ০০ ডায়াল করে ঢাকার নম্বরে ফোন করা। খরচ অনেক। কিন্তু দেখা গেলো কিছু কার্ড পাওয়া যায়, যেগুলো দিয়ে ভিন্নভাবে ফোন করা যায়। এগুলো ছিল এ রকম একটা কোনো কোড, তারপর আবার একটা কোড, তারপর কান্ট্রি ও এরিয়া কোড, তারপর নম্বর। এভাবে ফোন করলে আসলেই টাকা কম লাগত। ফলে এই কলিং কার্ডগুলোর ব্যবসা ছিল রমরমা। ব্যাকএন্ডে এগুলো ছিল ভিওআইপি সেবা। কিন্তু একটা সমস্যা হলো রিং বাজতে শুরু করলেই টাকা কেটে নিত। কাজে যাকে ফোন করব, সে যদি না ধরে তাহলেই খেল খতম, কিন্তু পয়সা উসুল হতোনা। কাজে সব সময় পরেরবার কখন ফোন করব, সেটা বলে রাখতাম বাসায়। আমাদের প্রবাসীরাও এই কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এর কারণ হলো আন্তর্জাতিক

কল মানেই গুচ্ছের টাকা। এটা সব দেশের জন্যই প্রায় একই ছিল। অন্য সময় ফোন করার পরিকল্পনা থাকলে ফোন করার আগে একটা এসএমএস পাঠানো হতো, এখন কী ফোন করা যায়” টাইপের।

লাতিন আমেরিকা ঘুরতে গিয়ে কৌম প্রথম এই সমস্যায় পড়লেন। এ তোমহা যন্ত্রণা। আর্জেন্টিনা থেকে আমেরিকায় বন্ধু-বান্ধবীর কাছে ফোন করার সময় করতে হয় এ রকম।

+54 + 9 + [area code] + [subscriber number]

জটিল ব্যাপার। এটা অ্যাভয়েড করতে চাইলে করতে হয় এসএমএস। সেটাও একটা খরুচে ব্যাপার। বেড়ানোর পর আবার সিলিকন ভ্যালিতে ফেরত আসলেন দুজন। কিন্তু কৌমের মাথায় ব্যাপারটা রয়ে গেল। সিলিকন ভ্যালিতে তখন ফেসবুকের বিকাশ। সবাই ফেসবুকে চাকরি পেতে চান। কাজে এক্টন ও কৌম দুজনই সেখানে চাকরির জন্য চেষ্টা করে সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থ হলেন।

চিত্র ২৬: হোয়াটসঅ্যাপের সহপ্রতিষ্ঠাতা জ্যান কৌম (বাঁয়ে) ও ব্রায়ান এক্টন (ডানে)

স্টিভ জবসের ম্যাজিক ফোন

জানুয়ারি ২০০৯-এ কৌম একটা আইফোন কেনেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন, আইফোনের অ্যাপ স্টোর এক নতুন অ্যাপ জগতের সূচনা করবে। সেই সময় অ্যাপ স্টোরের বয়স মাত্র সাত মাস। কৌমের

মাথায় নানান অ্যাপের চিন্তা। তবে লাতিন আমেরিকা সফরের দুঃখটা বেশি। নতুন একটা ধারণা শেয়ার করার জন্য আলেক্স ফিশম্যানের বাসায় হাজির হন তিনি। আলেক্স ফিশম্যান সিলিকন ভ্যালিতে কৌমের মতোরাশিয়া থেকে আসা লোকদের একটা আশ্রয়। নানা রকম পরামর্শ ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে তার বাসায় হয় আভড়া। কোনো কোনো সপ্তাহে সেখানে ৪০ জন লোকও জড়ো হয়। ফিশম্যানকে কৌম তার লাতিন আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তারপর নিজের আইফোনের অ্যাড্রেসবুক দেখিয়ে জানান। অ্যাড্রেসবুকের প্রতি নামের পাশে একটা স্ট্যাটাস থাকলে কেমন হয়? এতে থাকবে 'সে ব্যস্ত', 'ডিনারে যাচ্ছে', 'মিটিংয়ে যাচ্ছে' ইত্যাদি। ফলে অ্যাড্রেসবুকের অন্যরা তার বর্তমান স্ট্যাটাস সম্পর্কে জানতে পারবে। 'এটা তো লোকে ফোন করে বা এসএমএসে জানতে পারে। লোকে কেন তোমার অ্যাপ ব্যবহার করবে?' ফিশম্যানের এই প্রশ্নের উত্তরে কৌম জানান, ইন্টারন্যাশনাল কলে অনেক টাকা। এসএমএসেও তাই। এই স্ট্যাটাস দেখলে তখন ফোন করার ব্যাপারে সতর্ক হবে। ফিশম্যান তখন তাকে এই অ্যাপ বানাতে বলেন। তখন কৌম জানালেন ব্যাকএন্ডের কাজটা সে নিজেই করতে পারবে কিন্তু একজন ফ্রন্টএন্ড ডেভেলপার তার দরকার। ফিশম্যান তখন তার সঙ্গে রাশিয়ান প্রোগ্রামার ইগর সোলেমনিকভের পরিচয় করিয়ে দেন।

ইগরের সঙ্গে পরিচয় হতে না হতে কৌম ক্যালিফোর্নিয়ায় তার কোম্পানি নিবন্ধন করেন। নাম দেন হোয়াটসঅ্যাপ। কারণ, এটা শুনতে হোয়াটসঅ্যাপ মনে হয়। হোয়াটসঅ্যাপ নিবন্ধিত হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে জ্যান কৌমের জন্মদিনে। ফিশম্যানের ভাষায় 'কৌম খুবই গোছানো ছেলে'। ওই দিন পর্যন্ত অ্যাপের একলাইন। কোড়ও কিন্তু লেখা হয়নি।

তারপর কৌম কাজ করতে শুরু করেন। তার ব্যাকএন্ড কাজ হলো যে কোনো ফোন নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা। এটার সমস্যা হলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোড আলাদা এবং বিভিন্ন দেশের লোকাল এরিয়া কোডও আলাদা। আবার কোনো কোনো দেশে এরিয়া কোডের বদলে রয়েছে অপারেটর কোড। কাজে কৌমের কয়েক মাস লেগে

গেল এই কাজটা সমাধান করতে। এ জন্য কৌম উইকিপিডিয়ার একটি এন্ট্রি ব্যবহার করেছেন, যেখানে কান্ট্রি কোডগুলো ছিল। এভাবেই জন্ম হলো হোয়াটসঅ্যাপ ১.০ তথা স্ট্যাটাস অ্যাপের। এই সময় এমন ডেস্কটপে এমন স্ট্যাটাস স্কাইপে বা গুগলের জি-টকে দেওয়া যেত। অ্যাওয়ে’, ‘বিজি’, ‘মিটিং ইত্যাদি স্ট্যাটাস তখন এই দুই ব্যবহারকারী ব্যবহার করতেন। কিন্তু সেটি ছিল ডেস্কটপে। টেলিফোন নম্বর দিয়ে লগইন করা যায়, এমনটা কিন্তু ছিল না। কৌম প্রবল আগ্রহে অ্যাপ স্টোরে হোয়াটসঅ্যাপ রিলিজ করলেন। কিন্তু দেখা গেল এটা আইফোনে লোড করলেই ক্রাশ করে। এর অর্থ হলো এটি নিয়ে অনেক কাজ করতে হবে। তারপরও ফিশম্যান তার ফোনে এটি লোড করতে রাজি হন। ফিশম্যানের পর তার কিছু রাশিয়ান বন্ধুও হোয়াটসঅ্যাপ ডাউনলোড করেন। কিন্তু কেউ এটি তেমন ব্যবহার করছেন না। বাধ্য হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জান কৌম এক্টনকে জানান, তার টাকাপয়সা শেষের দিকে আর হোয়াটসঅ্যাপও তেমন কেউ ব্যবহার করছেন না। কাজে তার উচিত আবার চাকরির চেষ্টা করা। এক্টন তাকে আরও কিছুদিন দেখার পরামর্শ দেন।

‘আমি মার্কেটে যাচ্ছি’

১৭ জুন ২০০৯ সালে আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপল পুশ নোটিফিকেশন চালু করে। এর মাধ্যমে অ্যাপ ডেভেলপাররা চাইলে কোনো অ্যাপের ব্যবহারকারীকে যেকোনো সময় পিং (ping) করতে পারেন। এমন কি যখন কেউ ওই অ্যাপটা ব্যবহার করছেন না তখনো। এর মানে হলো অ্যাপ ব্যবহারকারী যখনই ইন্টারনেটে যুক্ত হবে, তখনই ওই অ্যাপে কোনো কিছু পাঠানো সম্ভব। কৌম দেখলেন, তার স্ট্যাটাস অ্যাপে এই সুযোগ কাজে লাগানো যায়। সামান্য এদিক ওদিক করাতে এটি ‘পুশ’ এনাবল হয়ে গেল। এর মানে হলো যখনই কেউ তার স্ট্যাটাস আপডেট করবেন, তখনই তার অ্যাড্রেসবুকের বা নেটওয়ার্কের সবার ফোনে এটা আপডেট হয়ে যাবে।

ফিশম্যানের রাশিয়ান বন্ধুরা এটাতে বেশ মজা পেল (তাদের কাছেই হোয়াটসঅ্যাপ ১.০ আছে)। তারা দেখলেন বন্ধুদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে জানানো যাচ্ছে। তখন তারা স্ট্যাটাস লিখতেন এ রকম, “আজকে ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছি, বা ‘আমি পথে আছি’। ফিশম্যান জানাচ্ছেন, কয়েক দিনের মধ্যে আমরা এটিকে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করি। একজন লিখি “হেই, তুমি কেমন আছ?” অন্য একজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় নিজের স্ট্যাটাস পরিবর্তন করে।’

এই স্ট্যাটাসের পরিবর্তন আসলে পুরো ব্যাপারটাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেল। প্রতিটা স্ট্যাটাসই কিন্তু একটি কথাপকথন শুরুর আবহ তৈরি করছে।

সান্টা ক্লারার বাড়িতে একটা ম্যাক মিনির সামনে বসে জ্যান কৌম এই স্ট্যাটাস পরিবর্তন দেখতে দেখতে বুঝতে পারলেন, তিনি একটা ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সিস্টেম বানিয়ে ফেলেছেন। পরে কৌম স্মরণ করেছেন, “আমরা লক্ষ করলাম মানুষ আসলে স্ট্যাটাস ব্যবহার করছেন কমিউনিকেট করার জন্য। যেমন কেউ একজন মার্কেটে যাবেন। সে স্ট্যাটাসে লিখে দিল, “আমি এক ঘণ্টা পরে বসুন্ধরায় যাচ্ছি। তার অ্যাড্রেসবুকের সবাই ব্যাপারটা জেনে গেল। এখন যে। তাকে মার্কেটে ধরতে চায়, সে তাকেই ধরতে পারে। ব্যাপারটা একটা বার্তা আদান-প্রদানই হয়ে গেল, তাই না?

‘অর্ধেক পৃথিবী দূরে একজন লোকের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছাতে পারা একটা বিরাট ব্যাপার। তার ওপর যে ডিভাইস তার কাছে সার্বক্ষণিকভাবে আছে, সেটি দিয়ে। কৌমের সরল স্বীকারোক্তি। ফোন থেকে এই সময় এ রকম মেসেজ আদান-প্রদান করা যায়। কেবল দামি ব্ল্যাকবেরিতে। গুগল জি-টক আর স্কাইপের দুর্বলতার কথা আগেই বলা হয়েছে।

চিত্র ২৭: হোয়াটসঅ্যাপের অফিশিয়াল লোগো

কৌম হোয়াটসঅ্যাপ ২.০ রিলিজ করলেন একটি মেসেজিং কম্পোনেন্ট যোগ করে। মানে স্ট্যাটাসে না লিখে এখন আপনি মেসেজ অপশনে লিখতে পারবেন। তারপর সেটা একজন বা কয়েকজনকে পাঠাতে পারবেন। মেসেজিং অপশন যোগ করার সময় কৌম তাতে আরও একটা ফিচার যোগ করে দিলেন। এখন এটি বিখ্যাত সবুজ দুই দাগ। মেসেজ পাঠানোর পর সেটা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ফোনে পড়া হলো কি না, সেটা প্রেরকের ফোনে আপডেট হওয়া। এক্টনের রান্নাঘরে বসে তারা দুজন একে অপরকে মেসেজ পাঠাতে শুরু করলেন। পাঠাতে পাঠাতে এক্টন বুঝে ফেললেন, তিনি এসএমএসের একটা নতুন কিন্তু কার্যকরী ভার্সন দেখতে পাচ্ছেন। তারপর তারা দুজন একটি স্টার্টআপ ফ্লোরে গিয়ে হাজির হলেন। এখানে তারা মাঝেমধ্যে আসতেন। অনেকগুলো কিউবিকলে উৎসাহী সব স্টার্টআপ উদ্যমী। একটা কিউবিকলে এক্টনের ডিকটেশনে কৌম কিছু ডকুমেন্ট বানিয়ে ফেললেন। এক্টন তখন সেগুলো তার ইয়াহুর বন্ধুদের কাছে পাঠানো শুরু করলেন। সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে বিনিয়োগের আহ্বান। এদের মধ্যে ৫ জন মিলে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার বিনিয়োগে সম্মত হন। আর এর বিনিময়ে ও খুশিতে এক্টনকে সহপ্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা আর শেয়ার দিতে রাজি হন কৌম। এদিকে স্ট্যাটাস আপডেট থেকে মেসেজিং অ্যাপে পরিবর্তনের ফলে এক লাফে তার ব্যবহারকারীর সংখ্যাও পৌঁছে গেল আড়াই লাখে! ডিসেম্বর ২০০৯ সালে তারা আইফোনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠানোর বন্দোবস্ত করে ফেললেন।

কিন্তু যতই জুসি হোক না কেন আড়াই লাখে গেলেও যত ডাউনলোড আশা করেছে, তত কিন্তু হয়নি। একসময় দেখা গেল অ্যাপলের ১৬০

কোটি ব্যবহারকারীর মধ্যে মাত্র ৬ কোটি ৮০ লাখ আমেরিকান হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছে। অথচ এক্টন ও কৌম আইফোন ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে স্রোতের মতোই-মেইল পেতে শুরু করলেন। কেউ স্ল্যাকবেরি ব্যবহার করেন, এমন বন্ধুদের কাছে কিংবা কেউ নোকিয়া ব্যবহারকারীদের কাছে মেসেজ পাঠাতে চান।

কিন্তু কৌম আসলে খেয়াল করলেন এই মেসেজিং সিস্টেমটা আমেরিকানদের জন্য খুব একটা বেশি কাজের নয়। কারণ, আমেরিকানরা দেশের মধ্যেই দৌড়ঝাঁপ করে বেশি, তারা অন্য দেশে বরং কমই যায়। অন্যদিকে ইউরোপিয়ান আর এশিয়ানদের মধ্যে দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা যেমন বেশি, তেমনি নানা দেশে তাদের যোগাযোগের লোকও বেশি। কাজে কৌমের মনে হলো এশিয়া ও ইউরোপের দিকে তার নজর দেওয়া উচিত। কিন্তু তারা আইফোন ব্যবহার করেন না। তারা স্যামসাং, হুয়াওয়ে, শাওমি, নকিয়া ফোন ব্যবহার করেন। ২০০৭ সালে নোকিয়ার তোরেকর্ড ইয়ার ছিল। ‘রাশিয়া, ইউক্রেন ও ইসরায়েলে আমার বন্ধুরা সবাই নোকিয়া ব্যবহার করে। কিন্তু কোনো এক কারণে নোকিয়া আমেরিকায় ততটা জনপ্রিয় নয়। শুধু তাই নয়, এদের ফোনগুলোর অপারেটিং সিস্টেম ভিন্ন ভিন্ন। অভিন্ন কোনো অ্যাপ স্টোরও নেই। সব হিসাব বলছে, অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা আসলে ‘গরিব। ওরা বেশি টাকাপয়সা খরচ করে না।

এ জন্য সেই সময়ে অ্যাপলের আইওএস থেকে ভিন্ন দিকে তাকানাটো মোটেই কোনো ভালো কাজ ছিল না। সিলিকন ভ্যালির গুরুরা সবাই তাকে বললেন, আইফোনে থাকতে। কারণ, সেখানেই টাকা। কিন্তু কৌম ভাবলেন, টাকার চেয়ে গ্রোথ বেশি দরকার। কাজে তিনি ডেভেলপার ভাড়া করলেন স্ল্যাকবেরি, অ্যান্ড্রয়েড আর নোকিয়ার জন্য। আগস্ট ২০১০ সালে অ্যান্ড্রয়েডের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ রিলিজ করলেন। নোকিয়া সাপোর্ট রিলিজ হলো ২০১১-এর আগস্টে।

এরপরই শুরু হলো ভোজবাজি। প্রতিদিন গড়ে ৩ লাখ ২৮ হাজার নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত হতে শুরু করলেন হোয়াটসঅ্যাপে। তাদের। বেশির ভাগ থাকেন ভারত, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপে।

১ ডলারের পেইড ভার্সন

এক্টন ও কৌম দুজনই শুরু থেকে বিনা পয়সায় কাজ করেছেন। সে সময়ে তাদের সবচেয়ে বড় খরচ হলো ফোন নম্বর ভেরিফিকেশন করা। ২ সেন্টে আমেরিকায় ফোন নম্বর ভেরিফাই করা গেলেও মিডলইস্টের কোনো নম্বরের জন্য সেই খরচ হতো৬৫ সেন্ট!!! কাজে তারা দুজনই ভাবলেন, এটিকে পেইড অ্যাপ করা যায়। নতুন ব্যবহারকারীরা একদিন দেখলেন, ডাউনলোড প্রতি ১ ডলার চার্জ করতে শুরু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। তবে তাদের খরচের তুলনায় প্রাপ্তিটা নেহাত কম ছিল না।

তত দিনে তারা টের পেয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপ টিকে যাবে। কাজে অফিস হয়ে গেল, যদিও সাইনবোর্ড লাগানো হলো না। ২০১১ সালের শুরুতে আমেরিকার প্রথম ২০টি অ্যাপের মধ্যে ঢুকে গেল হোয়াটসঅ্যাপ। না তখন পর্যন্ত কোনো পিআর বা বিজ্ঞাপন নেই। কারণ, কৌমের কথা হলো কাজ করতে হবে প্রোডাক্ট নিয়ে, প্রচার নিয়ে নয়।

আমাদেরও সুযোগ দিন

এক্টনের কাছে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল মানেই এক্সিট। কাজে তারা সযত্নে তাদের ঠেলে রেখেছে। কিন্তু সিকুইয়া পার্টনার জিম গোয়েটজ নাছোড়বান্দার মতোতাদের পেছনে লেখে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত ৮ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ নিতে প্রতিষ্ঠাতাদের রাজি করিয়ে ফেললেন। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হোয়াটঅ্যাপের ব্যবহারকারীর সংখ্যা পৌঁছে গেল ২০০ মিলিয়নে এবং স্টাফ সংখ্যা ৫০-এ।

নিজেদের কর্মীদের ভালো রাখার জন্য তখন তারা দ্বিতীয় দফায় বিনিয়োগ নিতে রাজি হন। সিকুইয়া তাদের আরও ৫০ মিলিয়ন ডলার

দিল। ভ্যালুয়েশন হলো ১.৫ বিলিয়ন ডলার। এই সময় তাদের ব্যাংকে ৮.২৫৭ মিলিয়ন ডলার কিন্তু ছিলই। মানে ২ বছর আগে নেওয়া ৮ মিলিয়নের পুরাটোই তাদের কাছে রয়ে গেছে।

ফেসবুকের সঙ্গে দেখা

১.৫ বিলিয়ন ডলারের ভ্যালুয়েশনের কিছুদিন পর ফেসবুক যোগাযোগ করে হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে। মার্ক জাকারবার্গ তখন ইন্টারনেট ডট অর্গ নামের একটি আন্দোলনের অংশ। এর মূলমন্ত্র হলো বিনা পয়সায় দুনিয়াবাসীর কাছে জরুরি ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়া। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে হোয়াটসঅ্যাপকে কেনার ঘোষণা দেয় ফেসবুক। দাম ঠিক হয় ১৯.৩ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে এক্টন ও কৌম নগদ পেলেন ৪ বিলিয়ন, ১২ বিলিয়ন ডলার পেলেন ফেসবুকের স্টক। বাকি ৩ বিলিয়নও দেওয়া হলো তিন বছরের রেসট্রিকটেড শেয়ার হিসেবে। সিকুইয়া পার্টনার তাদের মোট বিনিয়োগের ৫০ গুণ বেশি টাকা ফিরে পেল। কৌম থেকে গেলেন সিইও হিসেবে। এর তিন দিন পরই কৌম ঘোষণা করেন, হোয়াটসঅ্যাপে কথাও বলা যাবে।
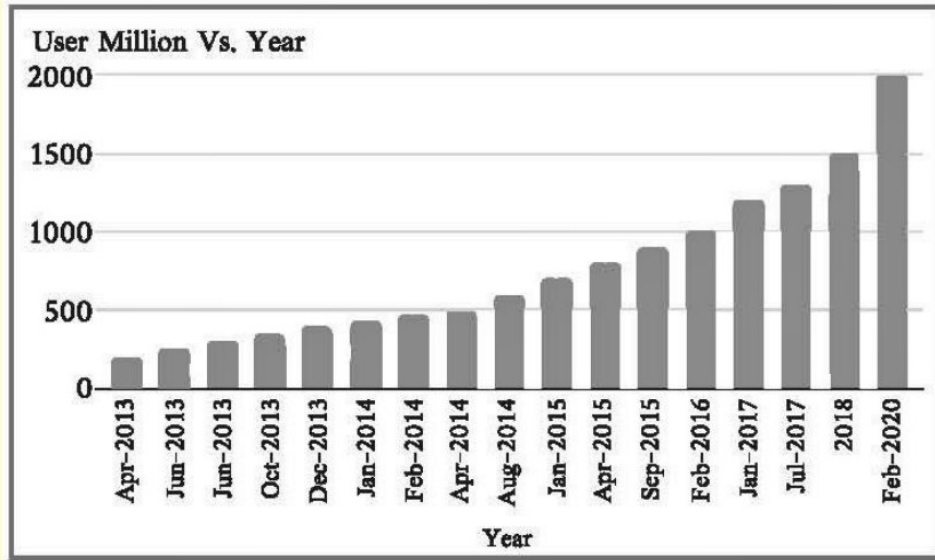
চিত্র ২৮: হোয়াটসঅ্যাপের অ্যাকটিভ গ্রাহকসংখ্যা (businessofapps)

২০১৪ সালের আগস্টে হোয়াটসঅ্যাপ হয়ে গেল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ। ৬০০ মিলিয়ন ব্যবহারকারী। তবে ফেসবুকের সঙ্গে

হিচিং লেগে গেল কৌমের। এপ্রিল, ২০১৮ সালে কৌম হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বের হয়ে যান। সঙ্গে ফেসবুকের পরিচালকের পদও ছেড়ে দেন।

শেখার যত কিছু

ইউক্রেন থেকে এসে সিলিকন ভ্যালিতে এত বিশালভাবে সফল হওয়ার কারণ কী? দেখা যাক।

শেখার জন্য বিনিয়োগ: কৌম কিন্তু বুঝতে পারেন তাকে কম্পিউটারের কিছু একটা শিখতে হবে। সেই জন্য তিনি টাকা খরচ করতেও পিছপা হননি। ওই সময়ে কৌমের মা বেবি সিটিং আর কৌম জেনিটরের। কাজ করতেন। কিন্তু ঠিকই টাকা খরচ করে বই কিনে পড়ে পড়ে শিখেছেন এবং সেই বই ফেরত দিয়ে আবার বই এনেছেন। যেহেতু বই ফেরত দিতে হবে তাই তার নোটবুকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে রাখতে হতো। অর্থাৎ সময় ও অর্থ দুটোই তিনি বিনিয়োগ করেছেন। শেখার জন্য।

বাড়তি খরচ নয়: ইয়াহুতে চাকরি করার সময় থেকে কৌম কোনো বাড়তি খরচের কাছে দিয়ে যেতেন না। দরকারের সময় যেন হাতে টাকা থাকে, সেটা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। ফলে ৯ বছর ইয়াহুতে চাকরি করার পর প্রায় ৪ লাখ ডলার তিনি সঞ্চয় করতে পেরেছেন।

সমস্যা দেখার চোখ: লাতিন আমেরিকায় গিয়ে তিনি প্রথম টের পেলেন আন্তর্জাতিক টেলিফোনের খরচ নেহাতই বেশি। কিছু কলিং কার্ড আছে, যেগুলো থেকে তিনি স্ট্যাটাস অ্যাপের ধারণা লাভ করেন।

ডেটার যুগে ডেটাই আসল: হোয়াটসঅ্যাপ কখনো ক্যাশকাই ছিল না। এমনকি ১ ডলার চার্জ করার পরও তারা অনেক টাকা আয় করেনি। তাহলে ফেসবুক কেন হোয়াটসঅ্যাপ কিনল ১৯ বিলিয়ন ডলারে? উত্তর হলো ডেটা। কেনার পর ফেসবুক কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপকে। ফ্রি করে দিয়েছে। প্রতিদিন ৬৫ বিলিয়ন মেসেজ আদান-প্রদান হয়। হোয়াটসঅ্যাপে। এগুলোর সবটাতেই লোকেশন ইনফো থাকেই। আর পার্সোনাল ডেটা তো আছেই।

গ্রোথে নজর, রেভিনিউতে নয়: কৌম কিন্তু গ্রোথের পেছনে এনার্জি দিয়েছেন। রেভিনিউ বাড়ানোর দিকে নজর দেননি। ওই সময়ে সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তারা জানতেন টেকাটুকা সব আছে হলো আইফোনে। অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা হলো গরিব। ওদের খরচ করার সামর্থ্য নাই। কাজে ওদের থেকে দূরে থাকো। তা ছাড়া অ্যান্ড্রয়েড তোহার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারে নানা শিবিরে বিভক্ত। কাজে বিনিযোগকারীরাও সেখানে বিনিয়োগ করতে চান না। কিন্তু কৌম এই সেকশনের কাছেই গেলেন। এতে তার রেভিনিউ না বাড়লেও গ্রোথ হয়েছে।
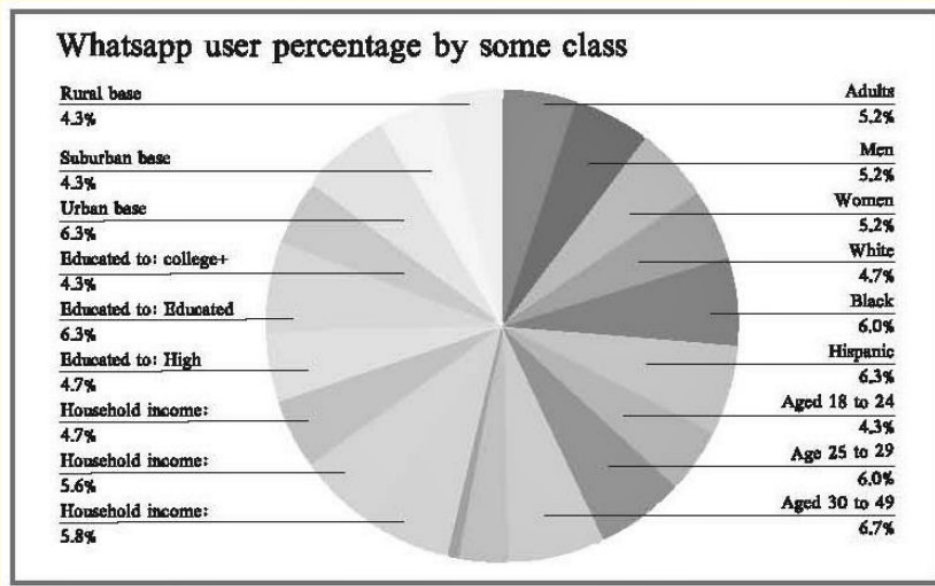
চিত্র ২৯: বিভিন্ন বয়সের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী (businessofapps)

বন্ধুদের নয়, কাস্টমারদের কথা শোনা: কৌম যখন তার হোয়াটসঅ্যাপ ১.০ চালু করেন, তখন তার বন্ধুরা সবাই তাকে বলেছেন, এটি একটি অসাধারণ আইডিয়া। তারা তাকে বলেননি যে তারা কেউ এটা ব্যবহার করবেন না। হয়তোতারা নিজেদেরই চেনেন না। পরে ২.০ বের করার সময়ে কৌম তাই নজর দিয়েছেন কাস্টমার ফিডব্যাকের ওপর। গ্রুপ চ্যাট, ইমেজ মেসেজ, মেসেজ সিন এসবই কিন্তু ডেটা। এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে ব্যবহারকারীরা এটা পছন্দ করেছেন। কাজে এটা নিয়ে এগোনো যায়। তা ছাড়া অ্যান্ড্রয়েড ও নোকিয়ার দিকে যাওয়ার বিষয়টা কাস্টমাররাই তাকে ফোর্স করেছেন।

এয়ারবিএনবি: তেলাপোকা উদ্যোক্তা

২০১৯ সালের আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের আসর বসেছে ইংল্যান্ডের বাথ শহরে, বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশ দল সচরাচর ভেন্যুতে যায় এবং সেখান থেকে ফিরে আসে। কিন্তু সেবার আমরা ভাবলাম শার্লক হোমস, স্টিফেন হকিংয়ের বাড়ির এত কাছে গিয়ে দেখে চলে আসব, কাজটা কি ঠিক হবে? তাই ঠিক করলাম, অতিরিক্ত দুই দিন থেকে আসা হবে। আমরা মোট ৯ জন। হোটেলে রুম নিতে হলে নিতে হয় পাঁচটা। হিসাব করে দেখা গেল, শুধু রাতে ঘুমানোর জন্য মেলা টাকা দরকার। যোগাযোগ করলাম লন্ডনপ্রবাসী তথ্যপ্রযুক্তিবিদ কামরুল সোহেলের সঙ্গে। সে জানাল, চিন্তার কিছু নেই। একটা সম্পূর্ণ বাড়ি আমাদের জন্য ভাড়া করে ফেলবে। কীভাবে? এটা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল এয়ারবিএনবির কথা। তত দিনে আমি নানা জায়গায় বক্তব্য দেওয়ার সময় উবার, ফেসবুকের সঙ্গে এয়ারবিএনবির কথা বলি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্যাক্সি কোম্পানির নিজের কোনো ট্যাক্সি নেই, সবচেয়ে বড় কনটেন্ট কোম্পানি নিজে কোনো কনটেন্ট বানায় না এবং সবচেয়ে বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নিজের কোনো রিয়েল এস্টেট নেই। কামরুল সোহেলই আমাদের বাসা ঠিক করে দিলেন। ডেকার রোডে একটা ডুপ্লেক্স বাড়ি। নিচতলায় একটা থাকার রুম, ড্রয়িংরুম, ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর এবং ওপরে তিনটি বড় রুম থাকার জন্য। বিশাল আলিশান বাড়ি। যথাসময়ে আমরা হাজির হয়ে দরজার আশপাশে চাবি পেয়ে গেলাম। বাড়িওয়ালীর সঙ্গে তখন দেখাই হলো না। ফেরার

দিন বাড়িওয়ালীর সঙ্গে দেখা হলো। তখনই আমার মনে হয়েছে, ব্যাপারটা কত অদ্ভুত। বাংলাদেশ থেকে গিয়ে লন্ডনের এক বাড়িতে থাকা যায়। বাড়িওয়ালা কিন্তু অপরিচিত। এটা যে শুধু আমার বেলায়। হচ্ছে তা নয়, বিশ্বব্যাপী কয়েক কোটি লোক এভাবে অন্যের বাড়ি বা সংযুক্ত কক্ষে থাকেন।

আইডিয়া হিসেবে খুবই নতুন নয়, আমাদের দেশেও একসময় পেয়িং গেস্টের প্রচলন ছিল। এখনো বড় শহরগুলোতে পেয়িং গেস্টের দেখা মেলে। কিন্তু এই পেয়িং গেস্টের ব্যাপারটা একটা বিলিয়ন ডলার আইডিয়াতে কীভাবে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে?

শুরুর আগে

আমেরিকায় বেশির ভাগ লোকই ইমিগ্র্যান্ট। চেসকি পরিবারও তা-ই। রবার্ট চেসকি পোল্যান্ডের আর ডোরার ইতালীয় বংশোদ্ভূত। তারা দুজনই সমাজকর্মী এবং ছেলে ব্রায়ান চেসকিকে তার ইচ্ছেমতোপড়ানোর ব্যাপারে একমত ছিলেন। ছোটবেলা থেকে আঁকাআঁকি, ডিজাইনে আগ্রহী ব্রায়ান তাই শেষপর্যন্ত ১৯৯৯ সালে ভর্তি হলেন রোডস আইল্যান্ড স্কুল অব ডিজাইনে। সেখানে পড়ার শেষ সময়ে। তার পরিচয় হলো জুনিয়র জোসেফ (জো) জেবিয়ার সঙ্গে। দুজনই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনে মেজর করেছে। শেষ বছরে তাদের একটা ইন্টার্নশিপ ডিজাইনের সুযোগ হয়, যেটি দুজন মিলে করতে হয়। জো। আর ব্রায়ান তখন একই টিমে কাজ করেন। এই সময় তাদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব হয়। এই সময় তারা দুজনই নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠান। গড়ার কথা ভাবতেন। কিন্তু ইন্টার্নশিপের পরপরই ব্রায়ানের ডিগ্রি কমপ্লিট হয়ে গেলে ব্রায়ান লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে যান চাকরি করার জন্য। ব্রায়ান পরে এক সাক্ষাৎকারে ক্যাম্পাসে তাদের শেষ দিনের কথা স্মরণ করেন। সেদিন জো তার সম্মানে একটা পার্টি দেন এবং বলেন, একদিন আমরা একটি প্রতিষ্ঠান বানাব, যা নিয়ে বই লেখা হবে।

ব্রায়ানের মা লস অ্যাঞ্জেলেসে ছেলেকে একটি ফোর্ড গাড়ি কিনে দেন। জো আরও এক বছর পড়ালেখার পর নিজের ডিগ্রি কমপ্লিট করে রওনা দেন সান ফ্রান্সিসকোতে। সেখানে একটা তিন রুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। জো একটা চাকরির পাশাপাশি নিজেই ডিজাইনের কিছু কাজ করার চেষ্টা করেন। এই সময় তাদের মধ্যে আবার যোগাযোগ হয়। যেকোনো কারণে হোক, লস অ্যাঞ্জেলেসে ব্রায়াসন জুত করতে পারছিলেন না। তখন ভাবলেন, একটা চাকরি নিয়ে সান ফ্রান্সিসকো চলে যাবেন। একটি প্রতিষ্ঠানে। ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি হলো না তার।

অন্যদিকে জো'র রুমমেট বাসা ছেড়ে চলে যায় এবং বাড়িওয়ালা ঘরভাড়াও বাড়িয়ে দেয়। জো তখন মরিয়া হয়ে ব্রায়ানকে সান ফ্রান্সিসকোতে এসে তার রুমমেট হতে বলে। জো'র চাপাচাপিতে ব্রায়ান শেষ পর্যন্ত সান ফ্রান্সিসকোতে এসে পড়ে জোর অ্যাপার্টমেন্টে।

সর্বহারাদের হারানোর ভয় কী?

এটি ২০০৭ সালের ঘটনা। ভাড়া বেড়েছে। দুজনের তখন কারওরই চাকরি নেই। এই সময় জো'র মনে হলো, ঘরভাড়া যদি তাদের জন্যই বেশি হয়, তাহলে নিশ্চয় যারা ট্রাভেল করে তাদের জন্য তা আরও বেশি। ভাবল, নিজেদের ড্রয়িংরুমটা ভাড়া দেওয়ার কোনো বুদ্ধি পাওয়া যায় কি না। সে সময় একটা ডিজাইন কনফারেন্সের প্রস্তুতি চলছে শহরে। জো ব্রায়ানকে ই-মেইল করল, "আমরা যদি আমাদের ড্রয়িংরুমটাকে ডিজাইনারদের থাকা এবং সকালের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে কিছু টাকা কামানো যেতে পারে। সাবলেট দেওয়ার ধারণাটা নতুন নয়। কিন্তু জো আসলে সাবলেটের কথা ভাবেনি। তার ভাবনায় ছিল অস্থায়ীভাবে ভাড়া দেওয়া। ব্রায়ানের এই আইডিয়া পছন্দ হলেও সমস্যা কিন্তু অনেক। বিশেষ করে মানুষ কোনো অজানা লোকের বাড়িতে থাকতে চাইবে না— যতই ওয়াই-ফাই, ডেস্ক বা সকালের নাশতার কথা বলা হোক না। কারণ, বিশ্বাস এবং অথেনটিসিটি। তারপরও তারা ঠিক

করলেন, তিনটি এয়ারবেড় ভাড়া দেওয়ার চেষ্টা করবেন। একটা ক্যাম্পের কারণে জো'র কাছে তিনটা এয়ারবেড় ছিল। কিন্তু তারা যে ভাড়া দিতে চান, এটি লোককে জানাবেন কেমন করে? সে সময় লোকে যা-ই করে না কেন, একটা ওয়েবসাইট বানানোর কথা ভাবে তারাও তা-ই করলেন। একজন ফ্রিল্যান্সারকে দিয়ে একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে নিলেন। খুবই সাদামাটা ওয়েবসাইট। হোম পেজে না আছে লোকেশন, না আছে শিডিউলিংয়ের ব্যবস্থা। ডিজাইনারদের সান ফ্রান্সিসকোতে স্বাগত জানানো হয়েছে। ডান দিকের কোনায় লেখা হয়েছে, 'Twodesigners create a new way of connect at this years IDSA Conference।' তারা জোর দিয়েছেন বিশ্বাস গড়তে। কেন এমন একটা বাসায় থাকা যায়। নাম দেওয়া হলো airbedandbreakfast.com।

ওয়েবসাইট বানানোর পর দুজন মিলে বের হলেন তাদের এয়ারবেডঅ্যান্ডব্রেকফাস্ট প্রমোট করতে। ডিজাইনার কনফারেন্সের যে ব্রশিয়র, তাতে তারা লিখলেন— এখানে থাকলে পাওয়া যাবে ফ্রি ওয়াই-ফাই, ফ্রি ব্রেকফাস্ট এবং একই ধরনের লোকের সঙ্গে নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ। এবং সেটা হোটেলের চেয়ে কম দামে। প্রতি বেড় প্রতি রাত মাত্র ৮০ ডলার। ডিজাইনার কনফারেন্সের আয়োজকেরা ব্যাপারটাকে নিলেন একটা ফান হিসেবে। কারণ, এমন কেউ করে না। কাজেই তারা তাদের কাগজপত্রে ব্রায়ান আর জোকে প্রমোট করে দিলেন। তারা তিনজন গেস্টও পেয়ে গেলেন কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী। বোস্টনের ৩০ বছর বয়সী ডিজাইনার কে, উটা থেকে পাঁচ সন্তানের পিতা মিচেল এবং অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির সদ্য স্নাতক বোম্বেওয়ালা আমল। তিনজনই কোনো হিচিং ছাড়া থাকলেন। ঘরভাড়া দেওয়ার টাকাও তাদের হয়ে গেল। তবে টাকার চেয়েও বড় বিষয় হলো, তারা টের পেলেন তারা একটা নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছেন। সেটা হলো, একটা ট্রাস্ট গড়তে পারলে লোকে অপরিচিতজনের বাসায় রাত কাটাতে পারে। তার মানে চাইলে তারা তাদের ব্যবসা বাড়াতে পারবে। কিন্তু কীভাবে?

কিন্তু ব্যবসাটাই-বা কী হবে?

একটা বিষয় বোঝা গেল, ট্রাভেলাররা মাটোমুটি নিশ্চয়তা পেলেই রাত কাটাতে রাজি হয়ে যাবেন অপরিচিতজনের বাসায় বা রুমে। কিন্তু তাদের রাত কাটানোর জায়গা দেবে কে?

সমস্যা অনেক। প্রথমত, অপরিচিত ডেকে আনলে তার সঙ্গে বিপদ আসতে পারে। সরাসরি বিপদ না হলেও এমনও হতে পারে যে কোনো অপরাধী কোনো একটা বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকল, জামাই আদরে। তারপর ধরা পড়লে তো সমস্যা।

জো আর চেসকি ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন, তাদের লক্ষ্য থাকবে কোনো ইভেন্টকে কেন্দ্র করে তাদের সেবাকে বিকশিত করা। তা ছাড়া এ রকম আরও কিছু সেবা আছে। বিশেষ করে তত দিনে ক্রেইগলিস্টের জয়জয়কার অবস্থা। লোকে ঘরভাড়া দিতে চাইলে এই লিস্টে তা প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়। তাহলে লোকে কেন তাদের সাইটে লিস্টিং করবে?

আরও একটা সমস্যা তারা খেয়াল করল, সেটা হলো তারা দুজনই ডিজাইন বুঝলেও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বোঝেন না। সব সময় লোক হায়ার করার চেয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। সেই চিন্তা থেকে জোর বন্ধু নাথান ব্লেচারর্জিককে বলা হলো যোগ দিতে। নাথান হার্ভার্ড থেকে পাস করা ইঞ্জিনিয়ার। বোস্টনেই থাকেন। দোমনা করে নাথান রাজি হলেন বোস্টনে থেকেই কাজটা করতে।

গড় ফাউন্ডার

দুজনই ছুটি কাটাতে বাড়ি গেলেন। সেখানে ব্রায়ানের মায়ের সঙ্গে ব্রায়ানের একটা বিখ্যাত কথাপকথন রয়েছে। নিজের উদ্যোক্তাগিরির কথা মাকে বলার পর মায়ের প্রতিক্রিয়া।

ব্রায়ান— মা, আমি এখন একজন উদ্যোক্তা।

ব্রায়ানের মা— হ্যাঁ। জানি। তুই একটা বেকার।

ব্রায়ান– না মা। আমি একজন উদ্যোক্তা। এন্ট্রাপ্রেনিউর।

ব্রায়ানের মা হ। তুই একজন পরিপূর্ণ বেকার। আনএম্প্লয়েড।

এই কথাপকথন থেকে বোঝা যায় ব্রায়ানের পরিবার কীভাবে ব্যাপারটা নিয়েছে। ঠাট্টা করলেও কেউ তাকে অবশ্য সরে আসতে বলেননি। নিজ নিজ ছুটি থেকে ফেরার পর জো এবং ব্রায়ান ঠিক করলেন, তাদের সাইটে অন্যরাও লিস্টিং করতে পারবে। মানে এটি হবে ট্রাভেলারদের জন্য কোনো ইভেন্ট চলাকালীন থাকার ব্যবস্থা করা। যে কেউ তাদের সাইটে এসে রুমের লিস্টিং করতে পারবে। তারা নেগোশিয়েট করে দেবে এবং ট্রাভেলাররা বাড়িওয়ালাকে সরাসরি পেমেন্ট করে দেবে। তো, ডিজাইন সম্মেলনের কিছুদিন পরই অস্টিনে সাউথ বাই সাউথওয়েস্ট নামে একটি টেক, মিউজিক আর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়। তারা ভাবলেন, সেটাকে কেন্দ্র করে পরের লটের জন্য কাজ করবেন। এ জন্য একটি বড় ওয়েবসাইটের প্ল্যান। করলেন। কিন্তু অচিরেই টের পেলেন, এত বড় কাজের জন্য নাথানকে রাজি করানো সম্ভব হবে না। আর নাথানের মতোএকজন ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া তাদের পক্ষে কাজ করাটাই অসম্ভব।

চিত্র ৩০ : এয়ারবিএনবির প্রতিষ্ঠাতা জো গ্যাবিয়া (বাঁয়ে), নাথান (মধ্যে) ও ব্রায়ান চেসকি (ডানে)।

তখন পর্যন্ত ব্রায়ানের ইচ্ছা, এটি একটি বিনা মূল্যের সেবা হোক। কারণ, তার ইচ্ছা, ‘এটি একটি আন্দোলনে পরিণত হবে। কিন্তু বাকি দুজন বোঝালেন, না, এটা পেইড সার্ভিস হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। তারা নতুন করে সাইট বানিয়ে আবার সেটা ‘লঞ্চ করলেন। কিন্তু এবার তেমন কোনো প্রেসের সাপোর্ট পাওয়া গেল না। আর পেইড কাস্টমার পাওয়া গেল মাত্র দুজন, যার মধ্যে একজন ব্রায়ান চেসকি নিজে। কারণ, সে-ও যাবে ওই সম্মেলনে।

অস্টিনে ব্রায়ান এসে টিয়েনডান লি নামের একজন পিএইচডি ছাত্রের এয়ারবেড় ব্যবহার করে। লি তাকে সকালে এক কাপ এক্সপ্রেসে কফিও খাওয়াতেন এবং গাড়িতে করে তাকে সম্মেলনে নামিয়ে দিতেন। এই সময় লির কাছে ব্রায়ান এয়ারবিএনবিকে ঘিরে তার স্বপ্নের কথা বলতেন।

মাত্র দুজন পেইড কাস্টমার হলেও সাউথ বাই সাউথইস্ট ব্রায়ানকে অনেক সাহায্য করে। প্রথমত, নিজেই কাস্টমার হওয়াতে সে টের পায়, সরাসরি হোস্টকে পেমেন্ট করার মধ্যে ঝামেলা আছে। কারণ, এই হোস্টরা কেউ পেশাদার নয়। ব্রায়ান নিজেও দুই দিন এটিএম থেকে টাকা তুলতে ভুলে যায়। বাসাবাড়িতে পয়সা থাকার কোনো কারণ নেই। এই দুই দিনে আমরা আসলে বন্ধু হয়ে গেছি’ বলে জানাচ্ছেন লি। ফলে ওর কাছে টাকা চাওয়াটাও বিব্রতকর মনে। হয়েছে। যাহোক এটিএম এই সমস্যার সমাধান করেছে, কিন্তু ব্রায়ানের মনে হলো যদি তারা এই সার্ভিস মনিটাইজড করতে চায়, তাহলে এটা নিয়ে ভাবতে হবে।

তবে এই সফরে তারা গুরুত্বপূর্ণ একটি যোগাযোগ তৈরি করতে সক্ষম হয়। তাদের তৃতীয় রুমমেট, যিনি কিনা তাদের এয়ারবিএনবির অংশ নন, ফিল রেইনেরি জাস্টিন টিভি নামে একটি স্টার্টআপে কাজ করেন এবং তার প্রধান নির্বাহীকে সঙ্গে নিয়ে একই সম্মেলনে হাজির ছিলেন। মিশেল সেইবেল ব্রায়ানের অনুরোধে তাকে সময় দিতে রাজি হন। ব্রায়ান সম্মেলনের পরে একদিন অতিরিক্ত থেকে মিশেলের সঙ্গে দেখা করেন। সব শুনে মিশেল বাহবাই দিলেন। জানালেন,

তিনি নিজে Couchsurfing.com নামে একটা সেবা ব্যবহার করে থাকেন। পরে তাদের এই মিটিংয়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মিশেল বলেন, ‘ওই সময় আমরা দুজন একটা হোটেলে বসে ছিলাম। মানে ব্রায়ানের সমস্যার মধ্যেই।’

সেই সময় মিশেলের বয়স মাত্র ২৫ বছর। পরবর্তী সময়ে মিশেল জাস্টিন টিভি (টুইচ নামে) আমাজনের কাজে ৯৭০ মিলিয়ন ডলারে এবং একটা ভিডিও অ্যাপ অটোডেস্কের কাছে ৬০ মিলিয়ন ডলারে বেচেছেন। ২০১৩ সাল থেকে ওয়াই কম্বিনেটরিস্কের একজন পার্টনার হিসেবে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু সে সময় তার বয়স মাত্র ২৫ এবং তিনি মাত্র নতুন সিইও হয়েছেন। এর কিছুদিন আগে মিশেল সেইবেল ওয়াই কম্বিনেটরের একজন ইনকিউবেটি ছিলেন। ওয়াই কম্বিনেটরের সহপ্রতিষ্ঠাতা সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তা এবং ভেঞ্চার বিনিয়োগকারী পল গ্রাহাম। ব্রায়ান ও জো হলেন সেইবেলের কাছে যাওয়ার কোনো উদ্যোক্তা, যারা পরামর্শ চায়। সেইবেল বললেন, তার সাধ্যমতোতিনি করবেন, কিন্তু তাদের কাজ আরও এগোলে তিনি তাদের ওয়াই কম্বিনেটরে যোগ দিতে সুপারিশ করবেন। এ ছাড়া কিছু অ্যানজেল বিনিয়োগকারীর সঙ্গেও দেখা করিয়ে দেবেন। ব্রায়ান কিন্তু তখনো জানেন না অ্যানজেল বিনিয়োগকারী মানে কী?

সাউথ বাই সাউথইস্ট থেকে পেমেন্ট লার্নিং আর একজন সেমিমেন্টর নিয়ে সান ফ্রান্সিসকোতে ফিরে এলেন। তবে তাদের সবচেয়ে বড় লাভ হলো মেন্টর হিসেবে সেইবেলকে পাওয়া। পরবর্তী সময়ে তারা সেইবেলকে বলতেন গড ফাউন্ডার।

বাড়ি ফিরে তারা ভাবছেন, এরপর কী করবেন? একটা ধারণা তত দিনে পোক্ত হয়েছে, ট্রাভেলাররা মাটোমুটি অপরিচিতজনের বাড়িতে থাকতে রাজি হবে। কিন্তু তাদের থাকতে দেবে কে?

এরই মধ্যে এসে পড়ল আমেরিকার নির্বাচন।

হোস্ট চাই, হোস্ট

ব্রায়ান ও জো ভাবলেন এটা নিয়ে আরও কাজ করতে। ২০০৮ সালে আমেরিকার নির্বাচন। ডেনভারে হবে ডেমোক্রেটিক পার্টির ন্যাশনাল কনভেনশন। কমবেশি ৮০ হাজার লোকের জমায়েত হবে। অত হোটেল রুম নেই। নেই পার্টিজানদেরও অত বাড়ি। পত্রিকায় ছাপা হয়েছে মাত্র ২৭ হাজার হোটেল রুমের কথা। কাজেই জো আর ব্রায়ান নেমে পড়লেন এই ইভেন্টকে কেন্দ্র করে। তারা ঠিক করলেন, সম্মেলনস্থলের আশপাশে তারা কিছু হোস্ট জোগাড় করতে পারবেন, যারা সম্মেলনের লোকদের রাখতে পারেন। তারা কিছু রুম জোগাড় করতে সক্ষম হলেন। সম্মেলনের দুই সপ্তাহ আগে তারা তাদের সাইট নতুন করে লঞ্চ করলেন। সেখানে যুক্ত করলেন একটা লোকেশন ম্যাপ, যাতে ট্রাভেলররা লোকেশন বের করতে পারেন সহজে। বলা বাহুল্য, এই নতুন ফিচার যোগ করাটা কিন্তু বড় কোনো কাজ ছিল না। কারণ, ম্যাপ তোসহজে পাওয়াই যায়। লক্ষণীয় যে এই সময়ে এয়ারবিএনবি কিন্তু প্রতিটি কেসের জন্য আলাদা করে কিছু বানায়নি। তাদের তখন মূল লক্ষ্য ছিল ইভেন্টের আশপাশে কিছু হোস্ট জোগাড় করা।

ডেনভার সম্মেলনের দুই সপ্তাহ আগে তাদের সাইট লঞ্চ হলো ২০০৮ সালের ১১ আগস্ট। এই সময় তারা নিজের কানেকশন ও পারসুয়েশন কাজে লাগিয়ে টেকক্রাঞ্চে একটা নিউজ করাতে সক্ষম হলো। এটি এত ট্রাফিক টানতে সক্ষম হলো যে একদিন সকালে তাদের ওয়েবসাইট ক্রাশ করে গেল। সেদিন আবার তাদের একটা পিচ ছিল। যেহেতু সাইট রেডি, তাই কোনো পাওয়ার পয়েন্ট ছাড়াই তারা সেখানে হাজির হয়ে বোকা বনে যান। যার কাছে গিয়েছেন। তিনি তাদের ফিরিয়ে দিলেন।

সাইট লঞ্চের পর দেখা গেল, ট্রাভেলররা যত আসছে তত বাড়িঘরই নেই। হোস্টরা ভাড়া দিতে আগ্রহী নয়। ব্রায়ান আবার তার পিআর কার্ড খেললেন। এবার তারা অ্যাপ্রোচ করলেন মাইক্রোব্লগারদের। কয়েকজন মাইক্রোব্লগার তাদের নিয়ে লিখলেন, যা কয়েকজন বড়

ব্লগারকে অনুপ্রাণিত করল এয়ারবিএনবির এই পাগলামি চিন্তাকে তুলে ধরতে। ফলাফল হলো একটি লোকাল পত্রিকা ডেনভার পোস্ট, এ নিয়ে একটা ফিচার করে ফেলল। ব্যস, এবার ন্যাশনাল পেপার। যেমন *পলিটিকো, নিউইয়র্ক ডেইলি টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমস*সহ বিভিন্ন পত্রিকা খবরটা ছাপল।

ফলাফল হলো ৮০০ লোক তাদের রুম ভাড়া দিতে রাজি হয়ে সাইটে এসে লিস্টিং করল। আর ৮০টি বুকিং পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে তারা। তাদের ব্যবসার একটা মডেল ও দাঁড় করিয়েছেন। প্রতিটি রিজার্ভেশন। থেকে তারা নিত ১০-১২ শতাংশ।

এই কাজ করতে গিয়ে তাদের একটি সমস্যা হলো। সেটি হলো, পেমেন্ট কীভাবে নেবেন? শুরুতে নাথান একটা সিস্টেম ডিজাইন করলেও বাকি দুজন সেটা নাকচ করে দেন। তারপর নাথান পেপাল সিস্টেমে টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যখন অনেকেই একসঙ্গে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে শুরু করেন, তখন পেপাল মনে করে এটি একটি স্ক্যাম। তারা অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দেয়। যাহোক, নাথান শেষ পর্যন্ত পেপালকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

কিন্তু দেখা গেল ডেনভার সম্মেলন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাইটে ট্রাফিক আবার কমে গেল। 'আহা, প্রতি সপ্তাহে যদি সম্মেলন। হতো কোথাও না কোথাও।'

ওবামা ও'জ ও ক্যাপ্টেন ম্যাককেইন।

এত দিন পর্যন্ত তাদের আয় বলতে কনফারেন্সে পাওয়া নিজেদের রুম ভাড়া। কিন্তু নিজেদের খরচ আর সাইটের খরচ তোআছে। এসব খরচ মেটানো হচ্ছিল জো আর ব্রায়ানের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। একদিন সকালে হিসাব করে দেখা গেল, তারা দুজনই নিজেদের লিমিটের কাছে পৌছে গেছেন। দুজনের ক্রেডিট কার্ডে দেনা প্রায় ২০ হাজার ডলার।

এই সময়ে তারা ডেনভার প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন। একদিন রান্নাঘরে সকালের নাশতা রেডি করতে করতে তাদের মনে একটা মহৎ চিন্তার উদয় হলো। তারা চিন্তা করলেন, তারা একটা সিরিয়াল বানিয়ে সব হোস্টকে পাঠাবেন, যাতে তারা সকালে সেটা অফার করতে পারেন। “আফটার অল এয়ারব্রেডঅ্যান্ডব্রেকফাস্ট-এর একটা অংশ হলো ব্রেকফাস্ট। দুই ডিজাইনার মিলে দুটি সিরিয়ালের প্যাকেট ডিজাইন করলেন। ‘Breakfast for Change’ স্লোগান দিয়ে।

জোনাথন ম্যান একটা জিঙ্গেলও লিখে দিলেন—

> Oh-my-god It's Obama O's
> Mommy, Can I have some please
> That's a really cool cereal that you
> oughta know
> Everybody's talking about Obama O's
> Just One Bite and you will understand cause
> Oh-my-god It's Obama O's
> Mommy, Can I have some please

ইউটিউব লিংক - https://youtu.be/OQTWimfGfV8
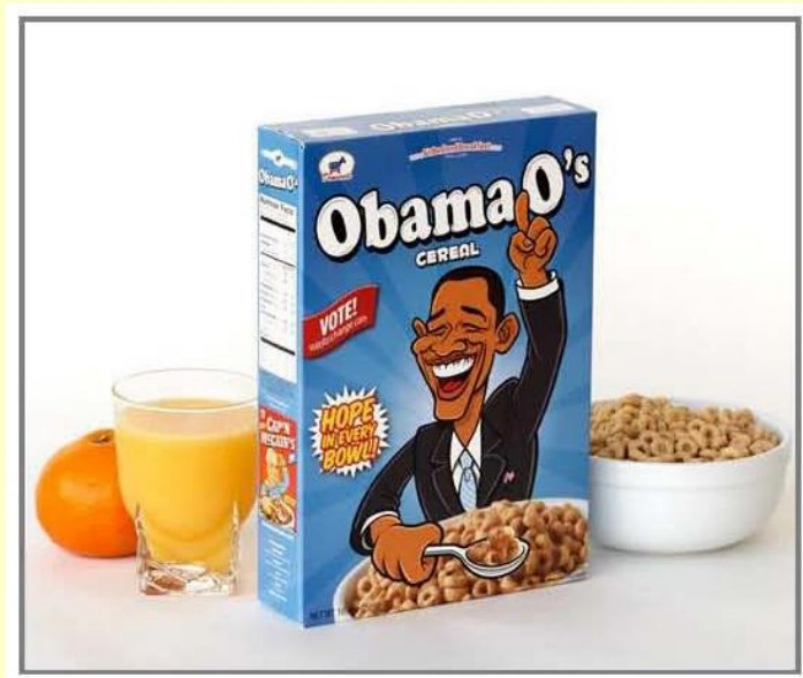
চিত্র ৩১: ওবামা ও’জের প্যাকেট

এর মধ্যে একটা হলো ডেমোক্র্যাটদের জন্য। নাম দেওয়া হলো ওবামা ও'জ। আর অন্যটির নাম ক্যাপ্টেন ম্যাককেইন। জো খুঁজে বের করলেন তাদের ডিজাইন স্কুলের একজন বন্ধুকে এবং তাকে অনুরোধ করলেন ৫ হাজার করে ১০ হাজার প্যাকেট বানিয়ে দেওয়ার জন্য। বন্ধুটি তাদের পাগলামিতে সাড়া দিলেন না। কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে ৫০০ করে ১ হাজার প্যাকেট ছাপিয়ে ডাই-কাট করে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিলেন। এত কম প্যাকেট দিয়ে কী হবে?

তখন তারা ঠিক করলেন, তারা সত্যি সত্যি সিরিয়াল বিক্রি করবেন। এ জন্য একদিন একটি সুপারশপে গিয়ে এক ডলার দামের যত সিরিয়াল ছিল সব কিনে নিয়ে আনলেন বাসায়। তারপর তারা দোকানের প্যাকেট থেকে সিরিয়াল নিজেদের প্যাকেটে ট্রান্সফার করলেন। আর ভাবলেন, ডেমোক্র্যাটদের সম্মেলনে ওবামা ও'জ বিক্রি করবেন প্রতিটি ৪০ ডলারে। কিন্তু সে সময় সবচেয়ে ভালো সিরিয়ালের দামই ৪ ডলার। কিন্তু ব্রায়ান একটা পিআর প্ল্যান করলেন। তার প্ল্যানের সুফল পাওয়া গেল। সম্মেলনে নেওয়ার পর সবাই হুমড়ি খেয়ে সব সিরিয়ালের প্যাকেট কিনে নিল। মাত্র তিন দিনে মাটোমুটি সব ওবামা ও'জ শেষ হয়ে গেল। পিআর ইফেক্ট এমন হাইপ তুলল যে কেউ কেউ তাদের সিরিয়াল ই-বেতে নিলামে তুলল। এর মধ্যে এক প্যাকেট বিক্রি হলো ৩৫০ ডলারে। আমাদের তিন উদ্যোক্তাও ফাও কিছু টাকা পেয়ে গেলেন।

কিন্তু দিন শেষে কী হলো। এখন পর্যন্ত হাজার পাঁচেক ডলার তারা পেয়েছে এয়ারবিএনবি থেকে আর ২০-৩০ হাজারের মাঝামাছি কিছু এসেছে সিরিয়াল বিক্রি থেকে। এতে লোন শোধ হলো, কিন্তু আবার আগের অবস্থায় ফেরত। নাথান বুঝলেন, এখানে শ্রম দিয়ে লাভ নেই। তিনি আবার বোস্টনে ফিরে গিয়ে কনসালটিং করতে শুরু করলেন। এদিকে জো আর ব্রায়ানের তখন খাওয়া বলতে ক্যাপ্টেন। ম্যাককেইনের সিরিয়াল। এমন সময় একদিন ব্রায়ানের মা ফোন করে ছেলেকে সিরিয়াল খাওয়ার জন্য দুধ কিনতে বলেন। উত্তরে জানতে পারেন, তার ছেলে স্ট্রাগল করছেন।

২০০৮ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এয়ারবিএনবির ফোকাস থাকল বিভিন্ন ইভেন্ট। এ সময় ৬৭ দেশের ৫৭৬টি শহরের কয়েক হাজার লিস্টিং সাইটে যুক্ত হলো। কিন্তু ডেমোক্র্যাটদের সম্মেলন শেষে তারা আবারও ফিরে গেলেন সপ্তাহে ২০০ ডলার আয়ে।

চ্যালেঞ্জ খুব ক্লিয়ার। তারা জানেন তাদের মডেলটা কাজ করবে। কিন্তু তাদের কাছে কোনো টাকাকড়ি নেই।

তেলাপোকা উদ্যোক্তা

ন্যাট আবার ফিরে গেল তার ডেরায়। জো আর ব্রায়ান তাদের আইডিয়া পরিশীলিত করার চেষ্টা করছেন। সপ্তাহে একদিন মিশেল সেইবেলের সঙ্গে তাদের আডডা। মিশেল তাদের প্রতিনিয়ত যেসব সাজেশন দিচ্ছেন, সেগুলোর কমপ্লিট বাস্তবায়ন করতে হলে নাটকে দরকার। এই সময় মিশেল তাদের কয়েকজন অ্যানজেল বিনিয়োগকারীর কাছেও পাঠাবেন। স্টার্টআপে একজন ইঞ্জিনিয়ার নেই, এটাই-বা কীভাবে সম্ভব। কাজেই ন্যাটকে রিকুয়েস্ট করাটাও অব্যাহত। এর মধ্যে মিশেল একদিন বললেন, তারা যেন ওয়াই কম্বিনেটরে অ্যাপ্লাই করেন। ব্রায়ান তত দিনে এই লাইনে কিছু পড়াশোনা করেছেন। তিনি জানেন, ওয়াই কম্বিনেটরে তারাই যায় যারা কিনা এখনো লঞ্চ করেনি। তারা তোতিনবার লঞ্চ করে ফেলেছেন। তাদের কাস্টমার আছে। তাদের নিয়ে টেকক্রাঞ্চ লিখেছে। তাহলে কেন তারা সেখানে অ্যাপ্লাই করবেন। কিন্তু সেইবেল পাত্তা দিতে দিলেন না। বললেন, নিজেদের দিকে তাকাও। তোমরা মারা যাচ্ছ। ওয়াইতে হলে ভালো হবে।

কিন্তু তত দিনে অ্যাপ্লিকেশনের টাইম চলে গেছে। মিশেল সেইবেল মেসেজ করলেন পল গ্রাহামকে। পল রাজি হলেন। কিন্তু এক শর্তে। সেটি হলো, সেদিনই মধ্যরাতের মধ্যে তাদের অ্যাপ্লিকেশন পৌঁছাতে হবে। রাতদুপুরে নাথানকে ফোন করে জানতে চাওয়া হলো তার নাম অ্যাপ্লিকেশনে থাকবে কি না। তারপর তিনজনের অ্যাপ্লিকেশন।

দেখা গেল, তাদের অ্যাপ্লিকেশন গৃহীত হয়েছে ইন্টারভিউয়ের জন্য। জো আর ব্রায়ান মিলে নাটকে আনায়ে নিলেন। তারপর তারা রওনা হলেন ওয়াই কম্বিনেটরের উদ্দেশে। ওয়াই কম্বিনেটর হরেদরে ৫০০ থেকে ৫ হাজার পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন পায়। এক সাইকেলে, সে সময় তারা নিয়েছে ১৬টি স্টার্টআপ! বোঝা যাচ্ছে, সেখানে ঢোকাটা কতটা কঠিন। ইন্টারভিউ হলো র‍্যাপিড ফায়ার সেশন, ১০ মিনিটের ফ্ল্যাট। কোনো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সুযোগ থাকে না। পল গ্রাহাম ও তার পার্টনাররা এই কারবার করেই বাছাই করেন। তাদের ইউকিউবেটিদের। নিজেরা নিজেদের মক ইন্টারভিউ নিয়ে তিন উদ্যোক্তা রওনা হলেন ওয়াই কম্বিনেটরের উদ্দেশে। যাওয়ার সময় জো ওবামা ও'জ ও ক্যাপ্টেন ম্যাককেইনের দুটি প্যাক নিজের ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে নিলেন। যদিও এ জন্য বাকি দুজনের অনেক বকা তার শুনতে হলো।

যতই প্রস্তুতি নেওয়া হোক না কেন, পল গ্রাহাম তাদের নাকচ করে দিলেন। তারা যখন বের হয়ে আসবেন, তখন জো তার ব্যাগ থেকে ওবামা ও'জ আর ক্যাপ্টেন ম্যাককেইন নিয়ে গ্রাহাম ও তার পার্টনারদের দিলেন। গ্রাহাম ভাবলেন, উদ্যোক্তারা তার জন্য এই 'অদ্ভুত' গিফট এনেছে। কিন্তু জো বললেন, না। তারা এটা বিক্রি করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এটার বিক্রির টাকাই তারা তাদের কোম্পানি ফান্ডও করেছেন। বিস্মিত পল সব শুনে বললেন, ওয়াও। তোমরা তো দেখা যাচ্ছে তেলাপোকা উদ্যোক্তা। তোমরা তো মরতে পারো না।

ফেরার সময় তারা জানলেন, নির্বাচিত হলে তারা গ্রাহামের কল পাবেন। কল পেলে সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বা না বলতে হবে। পরদিন তারা সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত কল পেলেন। পরে ব্রায়ান গ্রাহামের কাছে। শুনেছেন তাদের নেওয়ার কারণ। "তোমরা যদি মানুষকে কনভিন্স। করে ৪ ডলারের সিরিয়াল ৪০ ডলারে বেচতে পারো, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা ট্রাভেলারদের অপরিচিত মানুষের বাসায় থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

ওয়াইসি প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ হাজার এবং প্রতি উদ্যোক্তার জন্য আরও পাঁচ হাজার ডলার করে সিড মানি দেয়। সেই হিসাবে তিন উদ্যোক্তা

পেলেন ২০ হাজার ডলার। বিনিময়ে তাদের দিতে হলো ৬ শতাংশ। সেই সঙ্গে তারা পেলেন ওয়াইসিতে অ্যাডমিশন। কথা হলো, জানুয়ারির ৬ তারিখে শুরু হবে তাদের তিন মাসের ইনকিউবেশন। ন্যাট এসে আবার ডেরা গাড়লেন ব্রায়ানদের শহরে ও ডেরায়।

শুরু হলো নতুন করে লড়ে যাওয়ার লড়াই।

এখানে কী করছ?

নতুন একটা রুটিন হলো তাদের তিনজনের। ভোরে ভোরে ওয়াইসিতে চলে আসা। আশা, পলের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলার সুযোগ পাওয়া। ২০০৯ সালের ব্যাচের জন্য সময়টা খুব একটা ভালো নয়। কারণ, বিশ্বমন্দা। ভেঞ্চার বিনিয়োগকারীদের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে সিকুইয়া ক্যাপিটালের পার্টনাররা একটা মিটিং করেছে, যেখানে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়, যার শিরোনাম ছিল— 'RIP Good Times'। এ জন্য ওয়াইসির শিক্ষানবিশদের একটা সুযোগ দেওয়া হয় যে তারা চাইলে পরের ব্যাচের সঙ্গে আবার করতে পারবে। কিন্তু এই তিন উদ্যোক্তার এ রকম কিছুর সুযোগ নেই। সার্কাসের দড়ির শেষ মাথায় চলে এসেছে তারা।

অন্য সবার মতোতিন উদ্যোক্তার জন্য গ্রাহামের পরামর্শ হলো, ডেমো ডের জন্য তৈরি হওয়া। ডেমো ডে হলো বছরের দুটো বিশেষ দিন, যেদিন শিক্ষানবিশরা তাদের স্টার্টআপ বিনিয়োগকারীদের সামনে তুলে ধরে। সেবারের ডেমো ডের দিন ঠিক হলো মার্চে। পল গ্রাহাম বললেন, স্টার্টআপকে প্রফিটেবল হতে হবে। পরের প্রফিটেবল মানে হলো রামেন প্রফিটেবল। যার মানে হলো যথেষ্ট টাকা তুলতে পারা, যার ফলে উদ্যোক্তারা কমপক্ষে কাপ-নুডলস খেয়ে হলেও সারভাইভ করতে পারে। সময় তিন মাস।

তিন বন্ধু কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথম সবাই জানপ্রাণ দিয়ে খাটবেন, একসঙ্গে থাকবেন। কেউ কোনো সাইড প্রজেক্ট করবেন না। কিন্তু যদি শেষ দিনেও ফান্ড জোগাড় না হয়, তাহলে যার যার রাস্তা সে সে মাপতে পারবেন।

গ্রাহামের প্রথম দিনের লেকচারের পর তারা নিজেদের জন্য একটা গ্রাফ তৈরি করেছেন। এটি হকিস্টিকের মতোদেখতে রাজস্ব বাড়ার একটা গ্রাফ, যা গ্রাহাম দেখিয়েছেন তার লেকচারে। এই গ্রাফ তারা নিজেদের বাথরুমের আয়নায় লাগিয়ে দিলেন। মানে প্রতিদিন সকালে উঠে সবার আগে এটা দেখবেন আর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দেখবেন। প্রতি সপ্তাহে এটি আপডেট করবেন।

শুরু হলো একটা কঠিন সংগ্রাম। অসীমসংখ্যক জিনিস শিখতে হচ্ছে। কিন্তু তিনজনের কেউ হাল ছাড়বেন না বলেই ঠিক করেছেন। গ্রাহাম তাদের কাছে জানতে চান, তোমাদের কতজন কাস্টমার আছে?

– খুব বেশি নয়। ১০০ জন হবে।

– ওরা কোথায় থাকে?

– সবাই নিউইয়র্কে থাকে।

– আর তোমরা এখানে এই মাউনটেইন ভিউতে আছ।

– জি।

– তোমরা এখানে কী করছ? নিউইয়র্কে যাও।

এই ব্যাপারটা সিলিকন ভ্যালির সে সময়কার ট্রেন্ডের সঙ্গে যায় না। কারণ, সবার লক্ষ্য থাকে গ্রোথ বাড়ানো। এতে নতুন নতুন বিনিয়োগকারীদের চোখে পড়া যায়। কিন্তু গ্রাহাম তাদের বললেন ইউজার এক্সপেরিয়েন্স নিতে।

নিউইয়র্কে ওদের অনেক হোস্ট তা-ই কেবল নয়, সেখানে সব সময়। কিছু না কিছু হতেই থাকে। ফলে ভ্রাম্যমাণ লোকের সংখ্যা বেশ। আবার অ্যাপার্টমেন্টের একটা রুম ছেড়ে দিয়ে বাড়তি আয়ের লোকও কম নয়। যেহেতু কাজের জন্য আসে এমন লোকের জন্য কম দামি থাকার বিকল্প একটা ভালো অপশন। কাজে আশাই করা যায় যে এয়ারবিএনবি নিউইয়র্ক থেকে অনেক ট্রানজেকশনের আশা করতে পারে। সেটা তারা পানও। যা টুকটাক তাদের আয়, তা তারা সেখান থেকেই পান।

গ্রাহামের পরামর্শের পর তারা ঠিক করেন, প্রতি উইকেন্ডে দুজন। নিউইয়র্কে যাবেন এবং হোস্টদের সঙ্গে দেখা করবেন।

একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়ে দামি

প্রচ্ছদ দেখে একটা বইয়ের বিচার করা যায় না। এটা যেমন সত্য, তেমনি একটি বাড়িতে আমি থাকব কি না, সেটা তার ছবি কিন্তু অনেকখানি প্রভাবিত করে। নিউইয়র্কে গিয়ে তারা এই বিষয়টি বুঝতে পারলেন। ন্যাটকে বাড়িতে রেখে বাকি দুজন নিউইয়র্ক সফর শুরু করলেন। সেখানে গিয়েই তাদের অনেক উপলব্ধি হলো। ২০০৯ সালের একটা আর্কাইভ ভার্সন থেকে দেখা যাচ্ছে, সে সময় বেশির ভাগ হোস্টই তাদের লিস্টিংয়ে ছবি দিত না। একটা কারণ হলো, সে সময় ভালো ক্যামেরা সবার নেই। আইফোনও কিন্তু সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু জো আর ব্রায়ানের ধারণা হলো, ছবি দিলে কাজটা আরও ভালো হতে পারে। কী করা যায়?

এর মধ্যে তারা কিন্তু হোস্টদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করেছেন। নিউইয়র্কে তারা এসে থাকতে শুরু করলেন এয়ারবিএনবির সাইট থেকে রুম ভাড়া করে। থাকার পর সেগুলোর রিভিউ করতেও শুরু করলেন। আর ভেবে বের করলেন ছবি দেওয়ার তরিকা।

এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা ক্যামেরা জোগাড় করে ব্রায়ান হয়ে গেলেন ফটোগ্রাফার। সকালে যে বাসাতে সিইও হিসেবে দেখা করছেন, বিকেলে সেখানে যাচ্ছেন কোম্পানির ফটোগ্রাফার হিসেবে। রুমগুলোর ছবি তুলতে শুরু করলেন। হোস্টরাও মনের আনন্দে সেই ছবি লিস্টিংয়ের সঙ্গে জুড়ে দিতে শুরু করল। কয়েক দিন পর তারা ঠিক করলেন, তাদের হোস্টদের বিনা মূল্যে ছবি তোলার ব্যবস্থা করে দেবেন। এ জন্য তারা ফটোগ্রাফার নিয়োগ দিতে শুরু করলেন। হোস্টরাও দুর্দান্ত সহযোগিতা করলেন। ছয় মাস পরই দেখা গেল, ছবি ছাড়া তেমন কোনো লিস্টিং নেই। ছবি দেওয়ার পর নাইট বুকিংয়ের সংখ্যা বেড়ে গেল ব্যাপকভাবে।
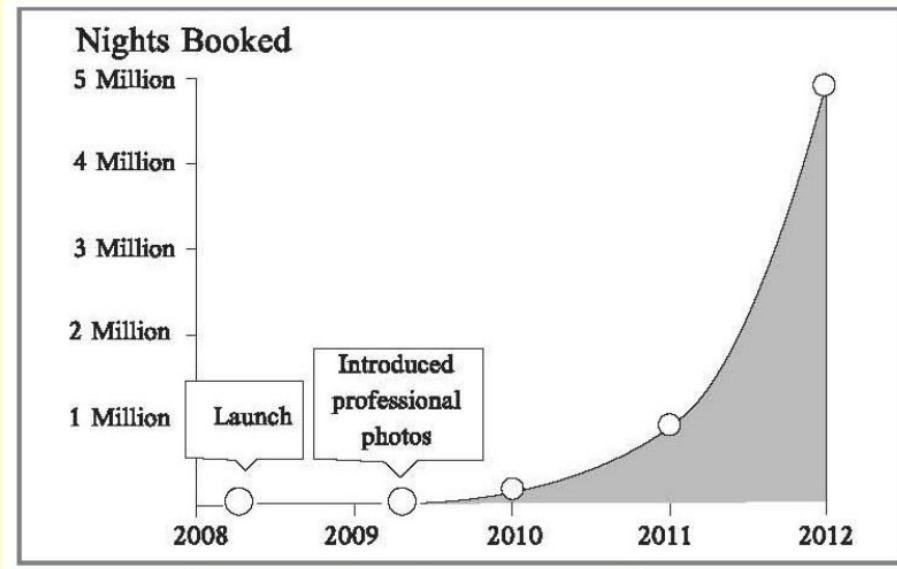
চিত্র ৩২: এয়ারবিএনবিতে গ্রাহকদের বুকিংসংখ্যা

অন্যদিকে এই ছবি তোলার অছিলায় এয়ারবিএনবির টিমের সঙ্গে তাদের হোস্টদের যোগাযোগ হয়ে গেল। প্রত্যেক হোস্ট কিন্তু আলাদা। তাদের সমস্যাও আলাদা। কিন্তু এই ছবি তোলার ঘটনায় তাদের সেই বিষয়গুলো জানা হতে থাকল। এগুলো কিন্তু একটা সার্ভে বা জরিপ করে তুলে আনা যেত না। এর ফলে তারা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন পেয়ে গেল।

এয়ারবিএনবির এই ফটো এক্সপেরিমেন্ট থেকে স্টার্টআপদের জন্য একটা ভালো শিক্ষণীয় বিষয় আছে। কারও কারও ধারণা স্টার্টআপ মাত্রই সুযোগ পেলে বা বিনিয়োগ পেলেই স্কেল আপ করা দরকার। কিন্তু কখনো কখনো অন্যদিকে, যেমন ইউজার এক্সপেরিয়েন্সের দিকে। নজর দিলেও কাজ হয়। সব হোস্টের কাছে ক্যামেরাম্যান পাঠানাটো একটা সমস্যা বটে, কিন্তু দেখা গেল এর ফলে ছবিওয়ালা হোস্টদের গেস্ট পাওয়ার রেট বেড়ে গেল আড়াই গুণ এবং গড়ে হোস্টদের আয় হতে লাগল মাসে ১ হাজার ২৫ ডলার। ছবি তোলা ছাড়াও দুই প্রতিষ্ঠাতা নিউইয়র্কে ছোট ছোট কিছু গেরিলা মার্কেটিংও করে ফেললেন।

পরে যখন সবার স্মার্টফোন হলো বা ছবি তোলা সহজ হলো, তখন এই সার্ভিস দেওয়া এয়ারবিএনবি বন্ধ করে দেয়। সার্ভিস বন্ধ করার

আগে উদ্যোক্তারা ২ হাজার ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফারকে ছয় মহাদেশে ১৩ হাজার লিস্টিংয়ের ছবি তোলার জন্য নিয়োগ দেয়।

অবশেষে বিনিয়োগ

ছবি তোলার ফলাফল তারা আরও ভালোভাবে পেতে শুরু করলেন। দৈনিক বুকিংয়ের সংখ্যা ২০-এ পৌঁছাল এবং একদিন তারা আবিষ্কার করলেন তাদের সাপ্তাহিক রেভিনিউ ১০০ ডলারে পৌঁছে গেছে। এটাই তারা লিখেছিলেন তাদের বাথরুমের আয়নার গ্রাফে!

কিন্তু তাদের বিনিয়োগকারী পেতে হবে। গ্রাহামের ওয়াইসিতে এমনিতে ভেঞ্চার বিনিয়োগকারীরা আসেন। এর মধ্যে একদিন আসলেন গ্রেগ ম্যাকএডো। গ্রেগ সিকুইয়া ফান্ডের একজন পার্টনার। আর সিকুইয়া হলেন গুগল, অ্যাপল, ওরাকলের বিনিয়োগকারী। গ্রেগ গ্রাহামের কাছে জানতে চান, তার কাছে 'মাটি কামড়ে পড়ে থাকা উদ্যোক্তা' আছে কি না। স্বভাবতই পল গ্রাহাম তার ভাষায় তেলাপোকা উদ্যোক্তাদের স্মরণ করলেন। কাকতালীয় হলো গ্রেগ এর আগে দেড় বছর ধরে ছুটিকালীন টুরিজম নিয়ে কাজ করেছেন। গ্রেগের কাছে তারা জানতে পারলেন, ছুটির সময়ের যে ব্যবসা, সেটি প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলারের। আলোচনা ফলপ্রসূ হলো এবং গ্রেগ বিনিয়োগে রাজি হলেন।

গ্রেগের আগে ওরা আরও ১৫ জনকে পিচ করার চেষ্টা করেছে। ৭ জন কোনো সময়ই দেননি। ৮ জন নানা বাহানায় বাতিল করে দিয়েছেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ফ্রেড উইলসনও ছিলেন। বছরখানেক পরে তিনি একটি ব্লগপোস্টে স্বীকার করেন, এয়ারবিএনবিকে ফান্ডিং না করাটা ভুল ছিল। তার অফিসে দীর্ঘদিন ধরে কনফারেন্স রুমে ওবামা ও'জের একটা প্যাকেট রাখা ছিল, যা তাদের ভুলের কথা মনে করিয়ে দিত। গ্রেগের সঙ্গে আলাপ করার সময় তারা ইউটিউবের সহপ্রতিষ্ঠাতা জাওয়েদ করিমের ইউনিভার্সিটিকেও পিচ করার সুযোগ পায়। এবার তাদের কপাল খুলল। এয়ারবিএনবির ভ্যালুয়েশন ধরা হলো ২.৪ মিলিয়ন ডলার। সিকুইয়া দিলেন ৫ লাখ ৮৫ হাজার আর ইউনিভার্সিটি ক্যাপিটাল দিল ৩০ হাজার ডলার।

মোট ৬ লাখ ১৫ হাজার ডলারের বিনিয়োগ। বিনিয়োগ শুধু তাদের টাকার সমস্যার সমাধানই করেনি; বরং তাদের স্টার্টআপের একটা সামাজিক স্বীকৃতিও দিল। এত দিন পর তারা নিজেদের জন্য বেতনও ধরতে শিখল— বছরে ৬০ হাজার ডলার প্রত্যেকের। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের স্বপ্নের প্রথম ধাপ পূরণ হলো। এর মধ্যে আগস্ট মাস নাগাদ তাদের দৈনিক বুকিংয়ের সংখ্যা ৭০-৮০-এ পৌঁছাল।

টিম বড় করতে হবে

বিনিয়োগের সুরাহা হওয়ার পর তাদের প্রথম চিন্তা হলো টিম বড় করতে হবে। প্রথমে টিমে ইঞ্জিনিয়ার দরকার। কারণ, তত দিন পর্যন্ত ন্যাট একাই সব আইটির কাজ করেছে। কিন্তু ব্রায়ানের মনে হলো, প্রথম রিক্রুটমেন্টের আগেই তাদের কোম্পানির একটা সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। কারণ, প্রথম দিকে যাদের রিক্রুট করা হবে, তারা কিন্তু কেবল কর্মীই হবে না; বরং তারা হবে অ্যাম্বাসেডর। তাদের দেখেই নতুন কর্মীরা আসবে। কাজেই সিলিকন ভ্যালির সব বিখ্যাত কোম্পানির কালচার নিয়ে পড়ালেখা করে তারা আবিষ্কার করল, সফল কোম্পানি মাত্রই কোর ভ্যালু আছে। সেটির ওপর কোম্পানির সংস্কৃতি। নিজেরা একটা কিছু বানিয়ে শুরু হলো রিক্রুটমেন্ট। অচিরেই কর্মীর সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে ওই বাসা ছেড়ে ব্রায়ানকে নতুন বাসায় উঠতে হলো।

গ্রোথ হ্যাকিং

এয়ারবিএনবির লোকেরা খেয়াল করলেন, ক্রেইগলিস্টে লোকজন। দিনের পর দিন রুমভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে আসছে। অনেক দিন আগে থেকে। সাবলেট আর লিজিংয়ের জন্য ক্রেইগলিস্ট একসময় সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। কাজে তারা ভাবলেন, কোনোভাবে ক্রেগলিস্টে কিছু করা যায় কি না। কারণ, মানুষ যত সহজে ক্রেইগলিস্টে পোস্ট করতে উদ্বুদ্ধ হয়, তত সহজে কিন্তু এয়ারবিএনবিতে হচ্ছে না।

অথচ বো গেবিয়া ঠিকমতোচিহ্নিত করেছেন দুই সার্ভিসের মধ্যে পার্থক্য। ক্রেইগলিস্টের সঙ্গে তুলনা করলে এয়ারবিএনবি কিন্তু সিকিউরড, পার্সোনালাইজড। তা ছাড়া ট্রানজেকশনও হচ্ছে এয়ারবিএনবির সাইটে। ক্রেইগলিস্ট আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেসের মতো। বাংলাদেশের ওই মার্কেটপ্লেস সম্পর্কে একটি অভিযোগ শোনা যায়। ওই সাইটে বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতার কাছে যাওয়ার পর বিক্রেতাকে মেরেধরে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তো, এ রকম অবস্থা থেকে এয়ারবিএনবি অনেক উন্নত। কারণ, তাদের হোস্টরা ভেরিফায়েড। টাকাপয়সার লেনদেন হচ্ছে ইলেকট্রনিক্যালি। তারপরও তাদের ইউজার কম। কাজে তারা ভাবলেন ক্রেইগলিস্টকে ব্যবহার করার। কিন্তু ঝামেলা হলো ক্রেইগলিস্টের কোনো এপিআই তখন ছিল না। তখন এয়ারবিএনবির ইঞ্জিনিয়াররা ক্রেইগলিস্ট হ্যাক করার বুদ্ধি বের করে ফেললেন। তারা এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন বানালেন, যা দিয়ে সহজে এয়ারবিএনবিতে পোস্ট দেওয়ার পর জানতে চাওয়া হয়, একই পোস্ট ক্রেইগলিস্টে দেবেন কি না। হ্যাঁ হলেই সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পোস্ট হয়ে যাচ্ছে।

একজন হোস্ট যখন এয়ারবিএনবিতে তার রুম পাবলিশ করছে, তখন একটা কুইক লিংক তার সামনে হাজির হচ্ছে। সেখানে একটা অপশন দেওয়া হচ্ছে, 'রিপোস্ট টু ক্রেইগলিস্ট'।

চিত্র ৩৩: গ্রাহকেরা তাদের তথ্য প্রদান করছেন ক্রেইগলিস্টে পোস্ট করার আগে (andrewchen.co)

১. ক্রেইগলিস্টে পোস্ট করার জন্য মোট পাঁচটা ফিল্ডে ডেটা এন্ট্রি করা লাগে। এয়ারবিএনবি তাদের পোস্টের ইনফরমেশন থেকে এই তথ্যগুলো সাজিয়ে হোস্টের সামনে দেখিয়ে নিচ্ছে। এর মধ্যে ক্রেইগলিস্টের ক্যাটাগরি ও মার্কেট ফিল্ড দুটো গুরুত্বপূর্ণ।

২. এই দুই ফিল্ড থাকাতে বোঝা যাচ্ছে, এয়ারবিএনবি এই পোস্ট ক্রেইগলিস্টে দিতে পারে।

৩. ক্রেইগলিস্ট এক্সপায়ারড হয়ে যাওয়া পোস্ট রিপোস্ট করার সুযোগ দেয়।

এটা এয়ারবিএনবির জন্যও প্রাসঙ্গিক। কারণ, ওখানে তোভাড়া হয়ে যাওয়ার পর আবার ফাঁকা হলে পোস্ট দেওয়া সম্ভব।

হোস্ট

১. ক্রেইগলিস্ট পোস্ট এক্সপায়ারড হয়ে গেলে সেটা সম্পর্কে জানতে পারছে।

২. এয়ারবিএনবির পোস্টই ক্রেইগলিস্টে পোস্ট করে দিতে পারছে।

৩. ক্রেইগলিস্টে ভিজিবিলিটি বাড়ছে। কারণ, রিপোস্ট সবার সামনে থাকে।

৪. ক্রেইগলিস্টে রিপোস্টিংয়ের একটি সঙ্গে এই হাইলাইটটা যোগ করা থাকল। AIDA (Attention, Interest, Desire and Action) থেকে দেখলে বোঝা যায়, এটি কতটা দরকারি।

৫. হেল্প বাটন!!! এটা মূলত এয়ারবিএনবির হোস্টদের ট্রাস্ট অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ, তারা জানছেন, বিপদে পড়লে তারা সাহায্য পাবেন।

এখন দেখেন, ক্রেইগলিস্টের জন্য প্রয়োজনীয় সব ইনফরমেশন এখান থেকে একজন পেয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সে পেয়ে যাচ্ছে বুকিংয়ের জন্য এয়ারবিএনবির লিংক। এর ফলে এয়ারবিএনবি ক্রেইগলিস্টের ব্যবহারকারীদের নিজেদের সাইটে টেন আনতে পারছে এবং এ জন্য ক্রেইগলিস্টে কোনো লেনদেন কিন্তু করতে হচ্ছে না। এরই

মধ্যে এয়ারবিএনবির সাইটে চমৎকার সব ছবি কিন্তু আছে। কাজে ক্রেইগলিস্টে বাসাবাড়ি খোঁজা লোকেরা দ্বিতীয়বারে কিন্তু সরাসরি চলে আসছে এয়ারবিএনবির সাইটে।

এই ক্রস পোস্টিংয়ের ব্যাপারটা দেখতে খুবই সহজ, কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল। ব্যাকএন্ডে ক্রেইগলিস্টের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশনের ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু ইউজার ইন্টারফেসটা একেবারেই সহজ ও সিম্পল। এর ফলে এয়ারবিএনবির লোকেরা কিন্তু বের করে ফেলতে পারল কত লোক ক্রেইগলিস্ট থেকে এসে তাদের ওখানে। যুক্ত হচ্ছে।

এই মনিটরিং কিন্তু সেন্সিবল। কারণ, কোনো একটা ফিচার। অপটিমাইজ করার আগে এ ব্যাপারে ডেটা দরকার। এয়ারবিএনবি রিপোস্টিংয়ের এই অ্যাপ্লিকেশনে অনেক চেঞ্জ করেছে, কিন্তু সেটা ব্যবহারকারীরা খুব একটা টের পায়নি।

এভাবে ক্রেইগলিস্টের লোক ধরে আনা ছাড়াও তারা আরেকটা বুদ্ধি করে। তারা একটা বট প্রোগ্রাম তৈরি করে, যা ক্রেইগলিস্ট থেকে ঘরভাড়া দিচ্ছে এমন লোকের কন্ট্যাক্ট ইনফো জোগাড় করে নিয়ে আসে। তারপর তাদের এয়ারবিএনবিতে পোস্ট করার অনুরোধ করতে থাকে। এভাবে আরও কিছু হোস্ট তারা জোগাড় করে ফেলে।

কাজ কাজ আরও কাজ

২০১১ সালে, শুরুর চার বছর পর ৮৯টি দেশ থেকে লিস্টিং যোগ হলো এবং মোট নাইট বুকিংয়ের সংখ্যা এক মিলিয়নে পৌঁছাল। একই বছরে সিলিকন ভ্যালির একটি বড় বিনিয়োগকারী ফার্ম তাদের পেছনে ১১২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করল। নতুন ভ্যালুয়েশন হলো এক বিলিয়ন ডলারের বেশি। মানে এয়ারবিএনবি হয়ে গেল ইউনিকর্ন।

কিন্তু সবকিছু স্মথলি হয় না। এক হোস্ট অভিযোগ করলেন যে গেস্ট তার বাসার বারোটো বাজিয়ে গেছে। এটা নিয়ে ব্যাপক হইচই হলো। অনেকেই ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও

ব্রায়ান এরপর হোস্টদের জন্য এক মিলিয়ন ডলারের ইনস্যুরেন্স সুবিধা চালু করলেন। আবার পাশাপাশি অনেক শহর কর্তৃপক্ষ এই শর্ট স্টের সুবিধা বন্ধ করার চেষ্টা করল। এমনকি নিউইয়র্ক শহরও এমন উদ্যোগ নিয়েছে। সেই সময় এয়ারবিএনবি তাদের হোস্টদের সংগঠিত করেছে। তাদের দিয়েই এই নিয়ন্ত্রণকাঠামোর বিরুদ্ধে লড়ে তারা এগিয়ে গেছে। যদিও এই সেবাকাজে পকেট থেকে বের হয়ে গেছে ৮ মিলিয়ন ডলার। এর ভেতরে ২০১৪ সালে তাদের নতুন লোগো এল। ২০১৬ সালে সিনেটর এলজাবেদ ওয়ারেন তাদের পক্ষে ওকালতি করলেন। তারপর এটা থামল। ২০১৬ সালে কিউবার সঙ্গে ব্যবসা চালুর পর বারাক ওবামা তার সফরসঙ্গীদের মধ্যে ব্রায়ান আর গেবিকেও সঙ্গে রাখলেন।

২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন শহরে লঞ্চিং, হোস্টদের সমাবেশ, এগুলো অব্যাহত রাখলেন তারা। ২০১৬ সালে তাদের ভ্যালুয়েশন হলো ৩০ বিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালে তারা ঘোষণা করেন যে ২০২০ সালে তারা শেয়ার মার্কেটে যাবেন। ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর তারা। শেয়ার মার্কেটে প্রবেশ করেন। এই লেখা লেখার সময় ২০২০ সালের শেষ দিনে তাদের বাজার মূলধন ছিল ৮৫ বিলিয়ন ডলার।
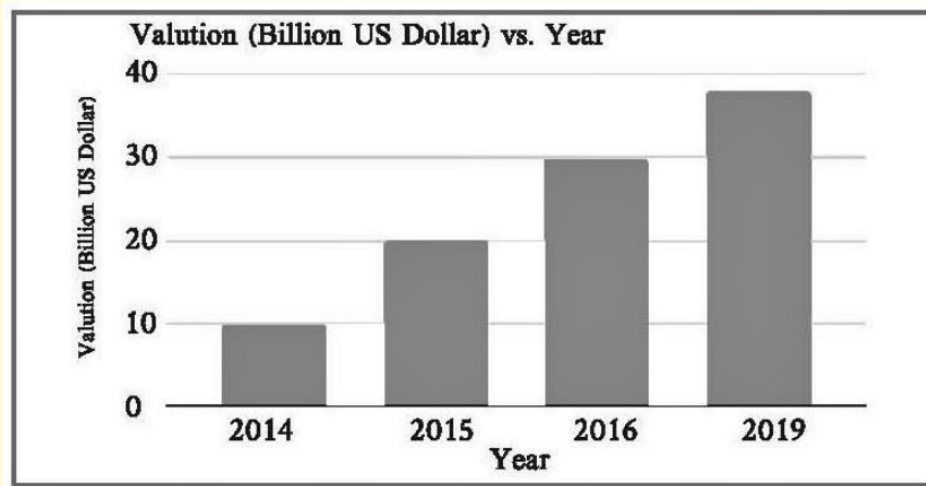
চিত্র ৩৪: এয়ারবিএনবির বাজার দর

---

*TechCrunch, Bloomberg, MarketWatch, Re/Code, The Wall Street Journal

করোনাকালের অভিজ্ঞতা

২০২০ সাল শুরু হয় গ্রোথ আর সম্ভাবনা নিয়ে। সঙ্গে শেয়ারবাজারে যাওয়ার প্রস্তুতি। কিন্তু তারপরই হাজির হলো মহামারি। বন্ধ হয়ে গেল চলাচল, বিমানবন্দর, ট্রেন স্টেশন। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেল ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি। ক্যানসেল হয়ে গেল লাখ লাখ বুকিং। সবকিছু পাল্টে গেল। পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে ব্রায়ান বলেছেন, ১২ বছরে আমরা যা অর্জন করেছি, ৬ মাসের মধ্যে তা শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। ১০ বছরের সিদ্ধান্ত ১০ মাসে নিতে হলো। এই সময় তারা বেশ কিছু কাজ করেন, যা প্রাধান্যযোগ্য—

কাস্টমারের কথা শোনা: হোস্ট ও গেস্ট দুই তরফের কথা শোনা। গেস্টের টাকা দ্রুত ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে, তা কার্যকর করা হলো। তাতে ক্ষিপ্ত হলেন অনেক হোস্ট। তাদের বক্তব্য হলো, তারা তোপ্রস্তুতি বাবদ টাকাপয়সা খরচ করে ফেলেছেন। তাদের কথা কে ভাববে? এয়ারবিএনবি ঠিকই তাদের কথা ভেবেছে। যেসব হোস্টের বেশি বুকিং ক্যানসেল হয়েছে, তাদের দেওয়া হলো প্রণাদনা। এ জন্য সিলভার লেইক ও সিক্সথ স্ট্রিট নামে দুটি ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম থেকে ঋণও করা হলো।

ডপেটার প্রতি নজর দেওয়া: ২০২০ সালের আগস্টের দিকে লোকজন আবার বের হতে শুরু করল এবং একটু একটু করে বুকিংয়ের সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। এই সময় দেখা গেল, যারা মুভমেন্ট করছে, তারা নিজের এলাকা থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যেই ভ্রমণ করছে। এই ডেটা থেকে দ্রুত তারা তাদের অ্যালগরিদম পরিবর্তন করলেন। দেখা গেল, কেউ কোনো জায়গা সার্চ করলে তাকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যেই ফলাফল দেখানো হলো। এতে বুকিংয়ের সংখ্যাও বাড়ল।

ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড ফর টু স্টেপ ফরওয়ার্ড: ২০২০ সালে অনেক প্ল্যান ছিল তাদের। ২০১৯ সালে হোটেল টু নাইট অধিগ্রহণের পর নিজেদের সাইটে হোটেলের যুক্ততার কথা ভেবেছে তারা। এ ছাড়া স্পেশাল মিটআপ, যেমন কবিতাসন্ধ্যা বা বিশেষ পার্টিও যুক্ত করার প্ল্যান ছিল। কিন্তু করোনাতে যখন তাদের রেভিনিউ ৬৬.৫ শতাংশ

কমে গেল, তখন তারা এসব পরিকল্পনা বাদ দিয়ে শুধু বেসিকে থাকল। কর্মীসংখ্যা কমিয়ে ফেলল, সব ধরনের বাহুল্য বাদ দিয়ে। টিকে থাকার চেষ্টা করল। এমনকি বাজারে তাদের ভ্যালুয়েশনও কমে গেল ১০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু মূল কাজে বাড়তি নজর দেওয়া, হোস্টদের জন্য ছোট ছোট মিটআপ করে তাদের উৎসাহ দেওয়া অব্যাহত রেখে ঠিকই তারা আবার ফিরে এলেন নিজেদের আসনে।
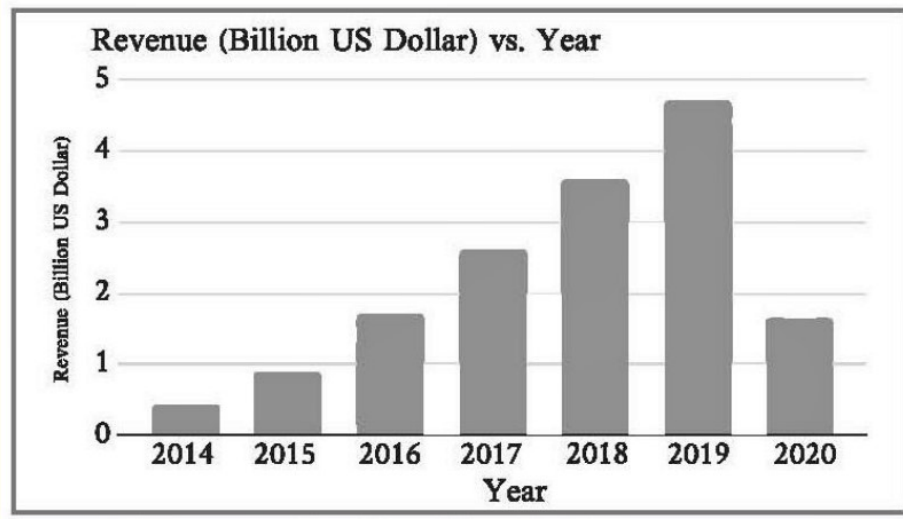
চিত্র ৩৫: এয়ারবিএনবির বার্ষিক রেভিনিউ (TechCrunch)

শেখার যত কিছু

একুশ শতকে সিলিকন ভ্যালির যত বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপ, তাদের মধ্যে আমি এয়ারবিএনবিকে একটু আলাদা করে রাখি। তেলাপোকার মতোখেয়ে না খেয়ে নিজেদের স্বপ্নের পেছনে দৌড়ানাটোই একমাত্র কারণ নয়। এয়ারবিএনবি আমার জানামতে এমন স্টার্টআপ, যার প্রাইভেট ভ্যালুয়েশন ৩০ বিলিয়ন ডলারে উঠেছে। যেখানে উদ্যোক্তারা দ্রুত শেয়ারবাজারে গিয়ে বড়লোক হতে চায়, সেখানে তাদের ১৩ বছর লেগেছে শেয়ারবাজারে আসতে। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের। বিকাশ থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। আমি তার কয়েকটি লিস্ট করলাম—

কাস্টমারকে চেনা: এয়ারবিএনবির লক্ষ্য ছিল সহজ। যারা কম দামে ভালো কোথাও রাত্রী যাপন করতে চায়, ট্রাভেলাররা। মূলত শুরুতে

এটা ইভেন্টভিত্তিক চাহিদা হলেও পরে কিন্তু দেখা গেল এ ধরনের চাহিদা প্রচুর আছে। তারা সেখানেই টার্গেট করেছে।

ধৈর্য আর লেগে থাকা: এটাতে তিন উদ্যোক্তাকে গোল্ড মেডেল দেওয়া যায়। স্যাটকে আমরা দেখেছি অনেক প্রশ্ন করতে, কিন্তু যখন দরকার। হলো তখন কিন্তু ঠিকই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পরিপূরক প্রতিষ্ঠাতা: তিন উদ্যোক্তার তিন রকমের স্কিল। পরস্পরকে সহায়তা করছে এবং পরামর্শ দেওয়া ছাড়া একজন আরেকজনের কাজে নাক গলায়নি।

মেন্টর: মিশেল সেইবাল তাদের একজন দুর্দান্ত মেন্টর। যদিও সেইবাল বলেছেন যে তার বুদ্ধি কম, কিন্তু ঠিকই প্রতি সপ্তাহে তাদের জন্য নতুন চিন্তা আর কাজের খোরাক দিয়ে দিতেন।

শেখার আগ্রহ: পল গ্রাহাম হোক কিংবা মিশেল সেইবাল হোক, যে যা বলছে সঙ্গে সঙ্গে সেটা শিখে নিচ্ছেন তারা তিনজন।

উদ্যোগ: নিজেদের উদ্যোগ বাঁচানোর জন্য যা যা করা দরকার, তার সবই করেছেন। ওবামা ও'জের কথা ভাবুন। খবর পেয়ে ব্রায়ানের মা ফোন করে বলেছিলেন— কী রে, আজকাল তুই নাকি সিরিয়াল বিক্রি করছিস।

ইউজার ফ্রেন্ডলি অ্যাপ ও ওয়েবসাইট: ২০১২ সাল পর্যন্ত এয়ারবিএনবি কেবল ওয়েবসাইটে কাজ করেছে। ২০১২ সালে তাদের অ্যাপ প্রকাশিত হয়। ব্যবহারকারীকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের ওয়েবসাইট ও অ্যাপ বানানো হয়েছে, যা খুবই সিম্পল। স্টিভ জবসের কাছ থেকে তারা শিখেছে কোনো বুকিংয়ের জন্য যদি তিনবারের বেশি ক্লিক করতে হয়, তাহলে সেটি ব্যবহারের সম্ভাবনা কমে যায়।

ই-মেইল ও নিউজলেটার: শুরু থেকে তাদের লক্ষ্য ছিল দ্রুততার সঙ্গে সার্ভিস দেওয়া। এ জন্য প্রথম থেকেই স্বয়ংক্রিয় ই-মেইল যোগ করা হয়। যখনই কেউ বুকিং করে, সঙ্গে সঙ্গে হোস্ট ও গেস্ট ই-মেইল। পেয়ে যান। অন্যদিকে তাদের নিত্যনতুন ফিচার ও স্টোরি নিয়ে নিউজলেটার প্রকাশিত হয়, যা পৌঁছে যায় গ্রাহকদের কাছে।

টেস্ট টেস্ট টেস্ট: ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপ, বিজ্ঞাপন থেকে ই-মেইল সব জায়গাতে তারা এ/বি টেস্ট করেছে। ওয়েবসাইটের ইউজার এক্সপেরিয়েন্সের বেলায় যেমন এটা সত্য, তেমনি সত্য বুকিংয়ের পর যে ই-মেইল পাঠানো হবে সেটার বেলাতেও। সার্বক্ষণিক টেস্টের কারণে তাদের কমিউনিকেশন হয়েছে উন্নত, প্রতিনিয়ত। টেস্টিংয়ের বাইরে তারা প্রতিনিয়ত হোস্ট ও গেস্টদের সঙ্গে কথা বলে।

ইনসেনটিভ: ভ্যাকেশন রেন্টালের একটা দুঃখ হলো, গেস্টরা থেকে চলে যায়। খুব সহজে রিভিউ দেয় না। রিভিউ দেওয়ার সূচনাটা উদ্যোক্তারা নিজেরাই করেছেন। এরপর তারা রিভিউ করার জন্য এবং রেফারেলের জন্য ইনসেনটিভ দিতে শুরু করেন। শুধু আর্থিক প্রণাদনা নয়, ডিসকাউন্ট, পরেরবারে ছাড়, বন্ধুর জন্য সুযোগএসবও সেখানে ছিল।

ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট: এয়ারবিএনবির একটা বড় গুণ হলো তারা তাদের কাস্টমারদের কনটেন্ট তৈরিকে নিজেদের জন্য ব্যবহার করছে। তাদের ইনস্টাগ্রামের ৮০% কনটেন্টই হলো ইউজিসি।

ক্যাম্পেইন ও পিআর-নিত্যনতুন ক্যাম্পেইন: এয়ারবিএনবি ফেসবুক নয় যে নিত্যনতুন ইন্টারফেস তৈরি করবে। কিন্তু তাদের কাজ হলো নতুন নতুন গেস্ট ও হোস্টকে আকর্ষণ করা। এই কাজ করার জন্য তারা নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেই থাকে। আর তাদের পিআর স্টান্ট তোসুবিদিত। যখন যেভাবে দরকার, সেভাবেই তারা পিআরে এগোয়। কখনো বড় টেকব্লগে, কখনো মাইক্রোব্লগে।

কাস্টমার সার্ভিস: শুরু থেকে কাস্টমার সার্ভিসে তারা নজর দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাগ্লোস ছিল তাদের আইকন। নিউইয়র্কে গিয়ে হোস্টদের। সঙ্গে আলাপের অভিজ্ঞতা তারা সব সময় মনে রেখেছে। এ জন্য তাদের কাস্টমার সার্ভিসকে সাজানো হয়েছে দ্রুততার সঙ্গে যেকোনো বিষয় নিস্পত্তি করার জন্য।

লুকিয়ে না থাকা: যখনই পত্রপত্রিকায় কোনো খারাপ রিভিউ ছাপা হয়েছে, তখনই তারা তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে। কখনো লুকিয়ে থাকেনি।

কানেক্টিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি

১৯৯৩ সাল। নিউইয়র্কে নিজের অফিসে কাজ করছিলেন ইকবাল কাদির। কাজের মাঝখানে হঠাৎ নেটওয়ার্ক ডাউন হয়ে গেল। গেল তোগেল, সহজে ঠিক হলো না। সারা দিন কোনো কাজই করতে পারলেন না আট্রিয়াম ক্যাপিটাল কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। ইকবাল কাদিরের মনে পড়ল ২২ বছর আগের কথা। বাংলাদেশ তখন মুক্তিযুদ্ধে। মায়ের সঙ্গে যশোর শহরের বাড়ি ছেড়ে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে ইকবালদের পরিবার। সেখানে একদিন ইকবালের মা ছোট একজনের জন্য ওষুধ আনতে অন্য একটা গ্রামে পাঠান ১৩ বছরের ইকবালকে। সকালে রওনা দিয়ে দুপুর নাগাদ ইকবাল কাদির ওই গ্রামে গিয়ে দেখেন ফার্মেসি বন্ধ। ফার্মেসির লোক শহরে গেছে ওষুধ সংগ্রহের জন্য। আবার দিনভর হেঁটে ইকবাল কাদির বাড়িতে ফিরলেন, খালি হাতে, একটি অর্থহীন দিন শেষে। কিন্তু ১৯৯৩ সালের ঘটনার পর এ ঘটনার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, আরে, ওই সময় যদি আমার যোগাযোগের উপায় থাকত? তাহলে তোআমি ওই দিন আর ওষুধ কিনতে যেতাম না। কারণ, আমি জেনে যেতাম ফার্মেসি বন্ধ। তার মানে কানেকটিভিটি বা সংযোগের ব্যাপারটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এটি উৎপাদনশীলতাকেই বাড়িয়ে দেয়। ইকবাল কাদির দীর্ঘদিন ধরে খোঁজা তার আপ্ত বাক্যটি খুঁজে পেলেন — *কানেকটিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি* সংযুক্তিই উৎপাদনশীলতা।

যশোর থেকে আমেরিকা

ইকবাল কাদির বড় হয়েছেন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে অনেক দূরের একটি শহর যশোরে। ঢাকা থেকে দূরের হলেও কলকাতার কাছে বলে যশোর ব্যবসায়িকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ছিমছাম শহর।
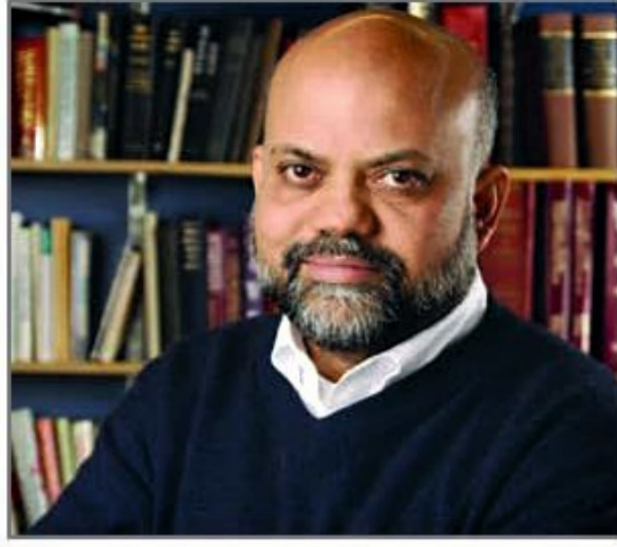
চিত্র ৩৬: গ্রামীণফোনের প্রতিষ্ঠাতা ইকবাল কাদির

ইকবাল কাদিরের আইনজীবী বাবা ঢাকার পরিবর্তে যশোরেই স্থায়ী হওয়ার পরিকল্পনা করেন। যশোর জিলা স্কুল হয়ে ইকবাল কাদির ভর্তি হন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পরপরই ইকবাল কাদিরের বাবা মারা যান। ৯ ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইকবাল কাদির। ১৯৭৪ সালে এসএসসি পাস করেন। সে বছরই দেশে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ হয়। কাদির ভাবেন, মাসহ পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নিজেকে দক্ষ হতে হবে। এ জন্য ১৯৭৬ সালে এইচএসসি পাস করে তিনি আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। ১৯৭৬ সালে ইন্টারনেট ছিল না। ঢাকায় ইউসিস সেন্টার থেকে কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যায়। বাকি সব তথ্য চিঠি লিখে জোগাড় করতে হয়। আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলোর সঙ্গেও চিঠিতে যোগাযোগ করতে হয়। শেষমেশ বৃত্তি জোগাড় করে আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার সোয়ার্থমোর কলেজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের

স্নাতক ডিগ্রি নেন ইকবাল। এর পরপরই তিনি পিএইচডি করতে মনস্থ করেন। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়ার্থন স্কুলে ভর্তি হন ডিসিশন সায়েন্সে। এখানে অনেক কোর্সওয়ার্ক করতে হয়। কোর্সওয়ার্ক শেষে ১৯৮৩ সালে তিনি এমএ ডিগ্রি লাভ করেন ফলিত অর্থনীতিতে। এরপর তিনি দুই বছর কাজ করেন বিশ্বব্যাংকে। কাজ করতে গিয়ে মনে হয়, ব্যবসা সম্পর্কে আরও জানা দরকার। কাজেই আবার হোয়ার্থনে ফিরে গিয়ে এমবিএ ডিগ্রি নেন।

কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে পড়তে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রতি ইকবাল কাদিরের আগ্রহ জন্মায়। বিশেষ করে প্রযুক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির মুরের তত্ত্ব তাকে অনুপ্রাণিত করে। ইনটেলের সহপ্রতিষ্ঠাতার নামে চালু এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, কম্পিউটারের প্রসেসিং ক্ষমতা একদিকে জ্যামিতিক হারে বাড়ে, অন্যদিকে সেই ক্ষমতার দামও কমে যায় জ্যামিতিক হারে। বলা হচ্ছে, মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে ২০০ ডলারের প্রসেসিং ক্ষমতা ১ ডলারে নেমে এসেছে। এর মানে অবশ্য এই নয় যে ১০০০ ডলারের কম্পিউটারের দাম ৫ ডলারে নেমে এসেছে, কিন্তু এর মানে হলো ১০০০ ডলারের কম্পিউটারের প্রসেসিং ক্ষমতা আগের চেয়ে ২০০ গুণ বেশি হয়েছে।

ইকবাল কাদির যখন আমেরিকায় মুরের তত্ত্ব কীভাবে গরিব দেশে কাজে লাগতে পারে তার হিসাব করছেন, তখন সেটির প্রয়োগ আমরা দেখে ফেলেছি। গেল শতকের আশির দশকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) পড়ার সময় আমাদের কম্পিউটার সেন্টারে কোটি টাকা দামের আইবিএমের মেইনফ্রেম কম্পিউটার ছিল। ১৯৯১ সালে আমি যখন সেখানে জয়েন করি, তখনই সেটার খরচ অনেক কমে যায়। ওই মেইনফ্রেম কম্পিউটারটি এখন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে সাজানো আছে। ওই কম্পিউটারের প্রসেসিং ক্ষমতার চেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতাসম্পন্ন স্মার্টফোন এখন অনেকের পকেটেই পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের এই দৃশ্য ইকবাল কাদিরকে ভাবাতে পেরেছে। ইকবাল কাদির ভাবলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি শিগগিরই গরিব মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসবে।

ইকবাল কাদিরের অন্য চিন্তাটা ছিল মূলধন নিয়ে। অর্থনীতিবিদেরা। মূলধন থাকলে উন্নয়ন হবে বলে যে ধারণা লালন করেছেন, সেটি তার দেশের জন্য খুব একটা কাজে লাগবে না। কারণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে মূলধন কই। কিন্তু উল্টোটা যদি হয় যে উন্নয়নের ফলে মূলধন সৃষ্টি হবে, তাহলে সেটা বাংলাদেশের অনুকূলে যেতে পারে। বাংলাদেশের মূলধন না থাকলেও শ্রমশক্তির অভাব নেই। কাজে মানুষকে সংগঠিত করতে পারলে মূলধন সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে বলে তার ধারণা হলো।

ম্যাক কম্পিউটার বিনিয়োগ

১৯৮৪ সালে স্টিভ জবস অ্যাপল থেকে ম্যাকিন্টোস কম্পিউটার বাজারে নিয়ে আসেন। ম্যাক’ নামে এটি পরিচিতি পায়। সে সময় অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে ম্যাক সবার কাছে পৌঁছে যাবে। ইকবাল কাদিরও এর ব্যতিক্রম নন। সে সময় তিনি বিশ্বব্যাংকে চাকরি করেন। তিনি ভাবলেন, সম্পদ সৃষ্টির একটা উদাহরণ তৈরিতে এটি তাকে সাহায্য করবে। কাজে ১৯৮৪ সালেই ইকবাল কাদির একটা ম্যাকিন্টোস কম্পিউটার কিনলেন। ছোট ভাই তারিক কাদিরের জন্য তিনি একটা বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসরও তৈরি করেন এই সময়। কিন্তু দ্রুত তিনি উপলব্ধি করেন, কম্পিউটার বাঙালির জন্য নয়। কেননা সেই সময়ে দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। বেশির ভাগই লিখতে-পড়তে পারেন না। তা ছাড়া যদিও কম্পিউটারের দাম কমেছে, কিন্তু তা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সহজে আসবে না।

১৯৮৭ সালে এমবিএ ডিগ্রি করার পর ইকবাল কাদির ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ে যোগ দেন। কয়েকটা অফিস শেষ করে তিনি নিউইয়র্কের আর্টিয়াম ক্যাপিটাল করপোরেশনে থিতু হন। এখানে তিনি স্টার্টআপ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার নানা দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। এর মধ্যে তিনি নজর রাখেন ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রতি। যথারীতি মুরের আইন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৯৯২ সালে আমেরিকাতে

ডিজিটাল সেলফোন চালু হয়। এরও এক বছর আগে সেটি চালু হয়েছে ইউরোপে। তারপর ১৯৯৩ সালে ঘটনাটি ঘটেছে, যার কথা শুরুতে বলা হয়েছে।

কানেকটিভিটি ইজ প্রোডাক্টিভিটি

নিউইয়র্ক শহরে নেটওয়ার্ক ডাউন হওয়ার পর ইকবাল কাদির। কয়েকটি বিষয় লক্ষ করেন। তিনি খেয়াল করলেন, টেলিফোন যোগাযোগের একটা মোক্ষম হাতিয়ার। এটি কম্পিউটারের মতোনয়। যে কেউ ফোন ব্যবহার করতে পারে এবং ফোন ব্যবহার করে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, যা কিনা তার নিজের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দিতে পারে। মানুষ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটির গুরুত্ব টের পাচ্ছে। কারণ, এটি সময় ও শ্রম দুটোয় বাঁচিয়ে দেয়। যেহেতু সেল ফোনও ডিজিটালাইজড হওয়া শুরু হয়েছে, কাজে মুরের আইনের কবলে পড়ে এটিরও দাম অনেক কমে যাবে। আর সেলফোনকে কম্পিউটারও বলা যায়, যা কিনা একটি বিশেষ সেবা ‘কথা বলার জন্য কাজ করে। ইকবাল কাদির ঠিক করলেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি ইউনিভার্সাল যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করবেন।

সেলফোনের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি ব্যবহারের জন্য আপনাকে অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করতে হয় না। চার্জ আর এলাকায় নেটওয়ার্ক থাকলে হয়। কোনো চিন্তা ছাড়াই একজন জেলের পক্ষে ফোন করে জেনে নেওয়া সম্ভব কোন বাজারে দাম বেশি পাওয়া যাবে। একইভাবে কৃষকেরও সময় বাঁচবে বাজারের চিন্তায়, ফলে সে বাড়তি সময় দিতে পারবে তার মূল কাজ বা কৃষিতে। এ ছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো যেহেতু আরও দূরদূরান্তে যোগাযোগ করা যাবে, কাজে কৃষকের চিন্তায়ও বৈচিত্র্য আসবে। সে নানা কিছুর চাষ করতে রাজি হবে।

নেটওয়ার্কের খরচ

প্রশ্ন হচ্ছে, সেলফোনের বিল দেবে কে?

ইকবাল ভাবেন, যেহেতু সেলফোন তার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াচ্ছে, কাজে তার সম্পদও বাড়ছে এবং সেখান থেকে সে বিল পেমেন্ট করতে পারবে। আর যেহেতু মুরের আইন আছে, বিলও ধীরে ধীরে কমে আসবে। তা-ই যদি হয়, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণও সেলফোনের বিল দিতে পারবেন। এই চিন্তা থেকে তিনি যোগাযোগ করেন গ্রামীণ। ব্যাংকের সঙ্গে। ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে তার প্রজেক্ট ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ব্যাংক তার রোল সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারল না। ডিসেম্বরে ইকবাল কাদির আবার দেখা করেন ড. ইউনুসের সঙ্গে। এরপর গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রহীতাদের সম্পর্কে আরও বিশদ জানার জন্য ছোট ভাই খালিদ কাদিরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন।
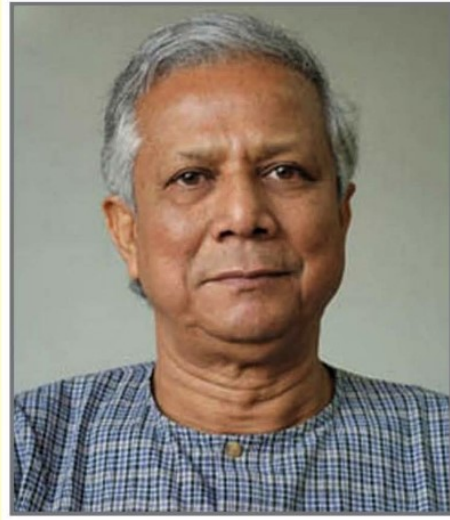
চিত্র ৩৭: গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণফোনের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনূস

গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাপারটা বোঝার পর তার একটাই চিন্তা, তা হলো কীভাবে প্রজেক্টের খরচ কম করা যায়। সে সময়ে বিশ্বের যেকোনো দেশে সেলফোন চালু করার খরচ মোটেই কম নয়। আর সেটা যদি হয় বাংলাদেশের গ্রামে, যেখানে অবকাঠামো বলতে তেমন কিছু নেই। কিন্তু ইকবাল কাদিরের গ্রামীণ ব্যাংককে দরকার। কারণ, সেলফোন।

চালু করলেই তোশুধু হবে না, এটির বিতরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের একটা ভালো মেকানিজমও দাঁড় করাতে হবে।

ইকবাল ভাবলেন, গ্রামীণ ব্যাংককেই এই কাজে লাগাতে হবে। তিনি দেখলেন, গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ নারীদের ঋণ দেয়। নারীরা মূলত গাভি কিনে সেটার দুধ গ্রামে বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে। গাভি ছাড়াও হাঁস, মুরগি, ছাগল, শাকসবজি চাষের জন্যও লোন দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ ইকবাল কাদির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে। সেলফোনই হতে পারে 'সেই গাভি'।

১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে ইকবাল কাদির গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে নতুন প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ নারীদের সেলফোন কেনার জন্য ঋণ দেবে, সঙ্গে সোলার চার্জার; যা দিয়ে ফোনটাকে চার্জ করা যাবে। ওই 'ফোন লেডি' তখন তার আশপাশে কমিউনিকেশন সার্ভিস বিক্রি করবেন। প্রতিটি কলের বিল থেকে ফোন লেডি একটা কমিশন পাবেন, যা দিয়ে তার ফোনের কিস্তিও পরিশোধ হবে, তার কিছু আয়ও হবে। এভাবে দুটি বড় সমস্যার। সমাধান হয়ে যেতে পারে। একটি হলো ফোনসেট বিতরণ, অন্যটি হলো ফোন কেনার জন্য মূলধন। দুটোরই সমাধান হলো গ্রামীণ ব্যাংক।

এবার গ্রামীণ ব্যাংক আকৃষ্ট হলো। ইকবাল কাদির *গণফোন ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন* নাম দিয়ে নিউইয়র্কে নিজের কোম্পানি গঠন করলেন। এক লাখ ডলারের একটা সিড মানিও জোগাড় করলেন। এই টাকার বেশির ভাগই খরচ হলো বিমান ভাড়ায়। কারণ, ইকবাল কাদিরের তখন কাজ হলো বিশ্বের বিভিন্ন সেল কোম্পানিকে পিচ করা, যেন তারা তার কথা শোনে। ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে নরওয়ের টেলিনর কোম্পানির কয়েকজন সিনিয়র লোক তার কথা শুনতে রাজি হন। তারা একটি অফিশিয়াল ফিজিবিলিটি স্টাডিও করেন।

পরের বছর টেলিনর, গ্রামীণ টেলিকম (একটি গ্রামীণ ব্যাংক উদ্যোগ) ও গণফোন যৌথভাবে একটি নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। এটির

নাম দেওয়া হয় গ্রামীণফোন। ১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে গ্রামীণফোনের বাজার মূলধন চার বিলিয়ন ডলারের বেশি।
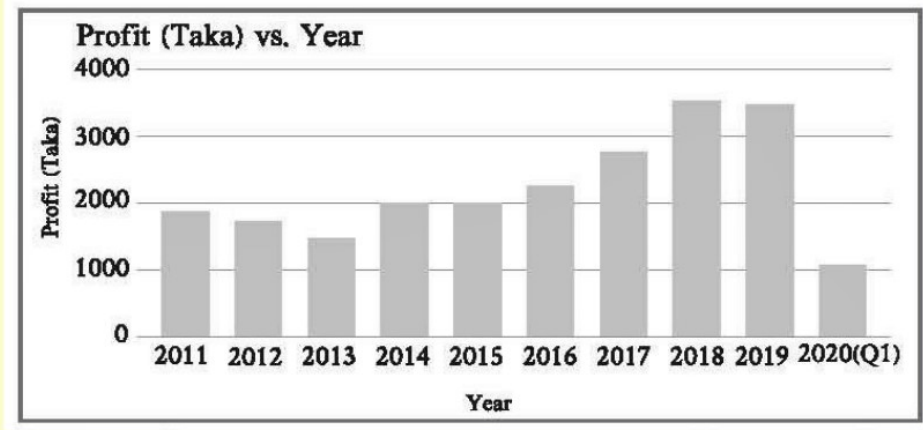
চিত্র ৩৮: গ্রামীণফোনের ২০১১-২০২০ (প্রথম ভাগ)-এর বার্ষিক লাভের পরিমাণ (গ্রামীণফোন এবং দ্য ডেইলি স্টার)

প্রতিদিন থেকে শেখা ইকবাল কাদিরের এই জার্নির একটা বড় অংশ হলো প্রতিদিনকার শিক্ষা। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তার এই জার্নির সময়েই তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনেছেন সাধারণের কাছ থেকে। ২০১৩ সালে দৈনিক প্রথম আলোয় তিনি এ রকম তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

‘১৯৯৪ সালের একদিন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি যখন তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি আমাকে চা এনে দিলেন। আমি তার সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম। জানতে পারলাম, নবম শ্রেণি পর্যন্ত তার পড়াশোনা। নিজে পড়ালেখা করতে না পারলেও একমাত্র মেয়েকে ডাক্তারি পড়াবেন এমনটাই পরিকল্পনা করছেন তিনি। মেয়ের ভবিষ্যৎ পেশা নিয়ে তার এ পরিকল্পনায় চমৎকৃত হলাম। এরপর আমি ঊর্ধ্বতন ওই সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমি তাঁকে জানালাম যে সাধারণ

মানুষের জন্য আমি একটি সাশ্রয়ী যোগাযোগব্যবস্থা চালু করতে চাই। তিনি ভাবলেন আমি পাগল হয়ে গেছি। কারণ, দেশের জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ আরও জরুরি চাহিদা এখনো মেটানো হয়নি। এখন এসব ব্যাপারেই তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ। এ ধরনের বিলাসবহুল জিনিস নিয়ে চিন্তা করার সময় তার নেই। আমি হতাশ হয়ে ফিরে আসি। আমি এই ভেবে অবাক হলাম, যেখানে একজন সাধারণ পিয়ন তার মেয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে পারেন, সেখানে কেন পেশাদার পরিকল্পনাকারীরা দেশ নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদের কোনো চিন্তা করছেন না। তাহলে কিসের পরিকল্পনা করছেন তারা?

'এরপর আমি উপলব্ধি করলাম, যদি আমি সত্যিই এ দেশের জন্য কিছু করতে চাই, তাহলে আমাকে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে। এরপর বাংলাদেশে ফোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি ঢাকায় বসবাস শুরু করি। মাঝেমধ্যে নিউইয়র্কে বেড়াতে যেতাম। ১৯৯৪ সালে আমি ঢাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনি। সেখানে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে থাকি। মাঝেমধ্যে মা এসে আমাদের সঙ্গে থাকতেন। তখন একজন মহিলা আমার বাসায় কাজ করতেন। তিনি একদিন আমাকে খামে ভরে একটি চিঠি পোস্ট করতে দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, খামের ওপর যেন কোনো স্ট্যাম্প না লাগানো হয়। আমি অবাক হলাম তার কথা শুনে। কেন স্ট্যাম্প লাগাব না? এটা করতে বেশি খরচও হবে না। তখন ওই মহিলা বললেন, যদি চিঠির ওপর স্ট্যাম্প না লাগানো হয়, তাহলে তার মা চিঠিটি পাবেন। তখন আমি গাটো বিষয়টি বুঝতে পারলাম। যদি চিঠির ওপর স্ট্যাম্প না থাকে, চিঠি পোস্ট করার বিষয়টি রেকর্ড হবে। আর ডাকপিয়ন প্রাপকের কাছ থেকে চিঠি পাঠানোর খরচ আদায় করবেন। আর যদি স্ট্যাম্প থাকে, তাহলে চিঠির বিষয়টি রেকর্ড হবে না এবং চিঠিটি প্রাপকের হাতে পৌঁছাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা থাকবে না। এটা ছিল আমার জন্য এক গভীর শিক্ষা। কারণ, বিশেষজ্ঞরা আমাকে বারবার বলেছেন। যে আমাকে অবশ্যই এই চিন্তা করতে হবে যে দরিদ্র মানুষকে টেলিফোন সেবা দেওয়ার বিনিময়ে চার্জ বলতে গেলে কিছুই নেওয়া হবে না। আর এ কারণে এ ধরনের ফোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। যা-ই হোক, আমার গৃহকর্মী আমাকে এটা বুঝিয়ে দিলেন যে দরিদ্র লোকজনও যথাযথ সেবা পেলে। তার জন্য অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত।

'সে সময় আমি প্রায়ই ঢাকা-নিউইয়র্ক করতাম। একদিন বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে আমার মা আমাকে বললেন, নিউইয়র্কে পৌঁছেই যেন আমি তাঁকে ফোন করে আমার পৌঁছানোর খবরটি জানাই। আমার তখন মনে পড়ে গেল সেই ১৯৭৬ সালের কথা, যখন আমি প্রথমবারের মতোযুক্তরাষ্ট্রে যাই। তখন আমার মায়ের কাছে কোনো টেলিফোন ছিল না। আমার পৌঁছানোর খবর তিনি পান কয়েক সপ্তাহ পরে একটি সাধারণ চিঠির মাধ্যমে। আর ১৮ বছর পর সেই মা তার ছেলে নিরাপদে পৌঁছেছেন, তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানতে চাইছেন।'

উদ্যোক্তাদের জন্য শিক্ষা

১. ইকবাল কাদির ও গ্রামীণফোনের জার্নি থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে বুঝতে পারা। গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের সেবা পাওয়ার জন্য টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করে না, এটাই হলো সবচেয়ে জরুরি শিক্ষা।

২. ম্যাকিন্টোস প্রজেক্টটা গোল্লায় গেলেও সেখান থেকে ইকবাল কাদির দুটি বিষয়ে নিশ্চিত হন—

- যেকোনো প্রোডাক্টই মানুষের অ্যাকচুয়াল নিডকে অ্যাড্রেস করতে পারতে হবে। সেই সঙ্গে সেটা পটেনশিয়াল ব্যবহারকারীর আয়ত্তের মধ্যে থাকতে হবে।
- যাদের হাতে টাকাকড়ি কম, তারা দ্রুত একটা সমাধান এবং পে-অফ চান। লম্বা সময়ের জন্য তারা বিনিয়োগ যেমন করতে চান না, তেমনি কোনো ভুলও করতে চান না।

৩. নিজের ওপর যখন আত্মবিশ্বাস জোরদার হবে, তখন রিস্ক নিতে হবে। পটেনশিয়াল পার্টনারকে বোঝার পেছনেও বিনিয়োগ করতে হবে। শুধু লিটারেচারের ওপর নির্ভর না করে গ্রামীণ ব্যাংকের

গ্রহীতাদের বোঝার জন্য ইকবাল কাদির তার ভাইকে দেশে পাঠিয়ে দেন।

৪. একটি মোবাইল কোম্পানি তখনই রাজি হবে, যখন কিনা একটি সাইজেবল গ্রাহক সে দেখতে পাবে। সে সময়ে বাংলাদেশে ৫০০ জনে। একটি ফোন ছিল। কাজে এমন কিছু করার দরকার যাতে কেবল গ্রাহকের নিশ্চয়তা পাওয়াই যাবে না, সেই সঙ্গে সেবাটাও বিকশিত হবে। গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রহীতাদের সংযোজন তাই একটি বড় শক্তি। ২০০৩ সালে গ্রামীণ ফোনের গ্রাহকসংখ্যা ১০ লাখে (১ মিলিয়নে) পৌঁছায়। এর মধ্যে তিন লাখই গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রহীতা।

মাত্র পাঁচ মাসেই কোটিপতি

ইন্টারনেটে ঘুরতে ঘুরতে কয়েক বছর আগে আমি প্রথম অ্যালেক্স টিউ এবং তার গল্প জানতে পারি। ২০০৫ সালে ২১ বছর বয়সে অ্যালেক্স এমন একটি কাজ করেন, যা তাকে কেবল মিলিয়নিয়ার বানায়নি, একই সঙ্গে জায়গা করে দিয়েছে ইন্টারনেটের ইতিহাসেও। অ্যালেক্সের উদ্যোগের বিশাল উইকিপিডিয়া পেজও আছে। ২০১৭ সালে আমার উদ্ভাবনের কলকবজা সিরিজে তার এই উদ্যোগ নিয়ে লিখেছি। স্টোরিটেলিং নিয়ে গবেষণার অংশ হিসেবে সম্প্রতি আমি আবার তার গল্পটা রি-ভিজিট করেছি। প্রথমে ছোট গল্পটা বলে নেওয়া যাক।

২০০৫ সালের আগস্ট মাসে অ্যালেক্স টিউ এই ধারণা নিয়ে মাঠে নামেন। এর কিছুদিন পর তার ইউনিভার্সিটি অব নটিংহামে তিন বছরমেয়াদি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি হওয়ার কথা। তার। চিন্তা হলো পাস করতে করতে তার অনেক টাকা স্টুডেন্ট লোন হয়ে যাবে। কাজে তিনি একটা ভিন্ন চিন্তা করেন। তিনি চেয়েছেন এমনভাবে টাকাটা জোগাড় করতে, সেটা যেন দীর্ঘমেয়াদি কোনো ঋণ না হয়। অ্যালেক্সের বাস ইংল্যান্ডে এবং সালটা ২০০৫। তার মানে ফেসবুক তখনো আঁতুড়ঘরে।

তার ‘সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস’ ধারণাটা সহজ। এতই সহজ যে আপনার মনে হতে পারে- আরে? এটা তোআমিও করতে পারতাম।

তো, ধারণাটা কী? অ্যালেক্স milliondollarhomepage.com নামের একটা ওয়েবসাইট বানালেন। এতে ১০ লাখ (১ মিলিয়ন) পিক্সেল আছে (১০০০ x ১০০০)। তিনি প্রতিটি পিক্সেল ১ ডলারে বিক্রি করবেন ঠিক করেন। ন্যূনতম ১০ x ১০ বা ১০০ পিক্সেলের একটি ব্লকে লোগো বসানো যায়। কাজেই ১০০ ডলার দিলে আপনি ১০০ পিক্সেল কিনতে পারেন এবং সেই ব্লকে আপনার ওয়েবসাইটকে লিংক করতে পারেন। খুব সহজ একটা বিজ্ঞাপনী সাইট। তার হিসাব হলো এতে তার ১ মিলিয়ন ডলার আয় হবে!

চিত্র ৩৯: অ্যালেক্স টিউ, মনিটরে তার ওয়েবসাইটটি

অ্যালেক্স ৫০ ডলার (এখনকার হিসাবে ৪ হাজার ২৫০ টাকা) খরচ করে ডোমেইন আর হোস্টিং কিনলেন এবং দুদিন খেটে ওয়েবসাইটটি তৈরি করলেন।

কিন্তু কেমন করে পিক্সেল বিক্রি করবেন?

কে তার এই ওয়াইল্ড আইডিয়া গ্রহণ করবে? ফেসবুক নেই যে তিনি একটা পোস্ট দেবেন আর মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। অবশ্য তার কাছে বুস্ট করার টাকাও ছিল না।

এসব ক্ষেত্রে নবীন উদ্যোক্তারা যা করেন, আলেক্সও তাই করেছেন। তিনি প্রথম তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে অ্যাপ্রোচ করেন। সহজ হিসাব– আমার এই আইডিয়াতে তুমি যদি সাহায্য করো, তাহলে

আমি বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু ফান্ড জোগাড় করতে পারি। আর তিনি। কারও কাছে বেশি টাকা চাননি মাত্র ১০০ ডলার। এভাবে দুই সপ্তাহে তিনি ৪ হাজার ৭০০ ডলার জোগাড় করতে সক্ষম হলেন।

মাত্র ৪ হাজার ৭০০ ডলার দিয়ে কীই-বা মার্কেটিং করা যাবে?

কোনো পত্রিকা বা টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অ্যালেক্স বুঝেছেন, তার এই আইডিয়াটা একটি ইউনিক আইডিয়া এবং এ জন্য মিডিয়া তার ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে। কাজে তিনি একটি পিআর কোম্পানি হায়ার করলেন। ওরাই তার হয়ে তার আইডিয়ার কথা লিখে-লিখে লন্ডনের সব মিডিয়ায় পাঠিয়ে দিল। সেই পিআর নজরে পড়ল বিবিসি ও গার্ডিয়ানের। তারা নিউজ করল। ব্যস, নিউজের সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার পিক্সেল বিক্রি।

আগেই বলেছি, সেই সময় ফেসবুক বা টিকটক নেই। কিন্তু গার্ডিয়ান আর বিবিসি থেকে ব্লগার আর তখনকার সোশ্যাল মিডিয়া সেটা পিক করল। ফলাফল?

পরের দুই সপ্তাহে বিক্রি হলো আড়াই লাখ পিক্সেল। আর তার ওয়েবসাইটে প্রতিদিন ৬৫ হাজার হিট হতে শুরু করল। তো, এত কিছু হতে থাকলে গ্লোবাল মিডিয়া কি বসে থাকবে? অ্যালেক্স পেয়ে গেলেন ৩৫টি দেশে তার কাঙ্ক্ষিত মিডিয়া কভারেজ।

দুই মাসের মধ্যে অ্যালেক্স অর্ধেক পিক্সেল বিক্রি করে ফেললেন। ওয়েবসাইট মেইনটেইন করার জন্য দুজন ইঞ্জিনিয়ার আর মুখপাত্র হিসেবে একজন মিডিয়ার লোককে নিয়োগ দিলেন। অ্যালেক্স শুধু খেয়াল রাখলেন কোনো পণ্য কোম্পানি যেন বিজ্ঞাপন দিতে না পারে।

শুরু করার ১৩৮ দিন পর, ৩১ ডিসেম্বর ৯ লাখ ৯৯ হাজারে পৌঁছে। যান তিনি। বাকি ১০০০ পিক্সেল বিক্রির জন্য অ্যালেক্স ই-বেতে নিলামের ব্যবস্থা করেন। ১১ দিন পর MillionDollarWeightLoss.com ওই ১০০০ পিক্সেল কিনে নেয় ৩৮ হাজার ডলারে। তার মানে অ্যালেক্সের মোট বিক্রি হলো ১,০৩৭,০০০ ডলার (১০ লাখ ৩৭ হাজার ডলার)। এখনকার বাজারমূল্যে এটি মাত্র সাড়ে আট কোটি টাকা ! ! !

গল্প শেষ। সিম্পল আইডিয়া, দুর্দান্ত এক্সিকিউশন এবং দারুণ সমাপ্তি।

অ্যালেক্সের এই সাফল্যের কারণ কী?

বলাবাহুল্য, প্রথম কৃতিত্বটা দিতে হবে তার আইডিয়াকে। কারণ, এ রকম ইউনিক আইডিয়া তার আগে কেউ আনতে পারেননি। ওয়েবসাইটের নাম ও ট্যাগলাইন ইন্টারনেট ইতিহাসের এক অংশের মালিক হন (Own a Piece of Internet History)-ও অনেক দৃষ্টিনন্দন। কিন্তু এ রকম অনেক আইডিয়া মাঠে মারা গেছে। এবং প্রতিদিন যাচ্ছে। তাহলে অ্যালেক্স কেন সফল হলেন?

শুরুতে তিনি একটি ওয়েবসাইট বানিয়েছেন, যেটি দারুণভাবে কাজ করে। ম্যানেজমেন্টও সহজ করে। মাত্র এক পাতার ওয়েবসাইট হলেও সেটা বানাতে তিনি দুই দিন দুই রাত খেটেছেন।

অ্যালেক্স জানতেন, তার এই আইডিয়া দ্রুত ক্যাশ করতে হবে। কারণ, জানাজানি হলে অনেক জায়ান্ট কোম্পানি দ্রুত কপি করে ফেলবে। আইডিয়া। কাজে তার একটা বড় বাজ দরকার। এবং সেটা দিতে পারে মিডিয়া। কিন্তু অ্যালেক্স প্রথমেই মিডিয়ায় যাননি। ধারদেনা করে যেতে পারতেন কিন্তু যাননি। তিনি ভেবেছেন, যদি শুরুতেই মিডিয়া কভারেজ পান, তাহলে সবাই সাইটে এসে দেখবে সেটা খালি। তার প্রুফ দরকার। কাজে তার দরকার সাইটের একটা অংশ ভরা।

সেটা কার কাছে বেচা যায়?

এমন লোকের কাছে, যারা তাকে চেনেন এবং এমনিতেই হয়তো তাকে ১০০ ডলার দিতে পারেন। অ্যালেক্স তাই তার বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের কাছে গেছেন এবং ৪ হাজার ৭০০ পিক্সেল তাদের কাছে বেচেছেন। এই বেচার সময় কিন্তু তিনি তাদের ফান্ডরাইজিংয়ের কথাই বলেছেন। বলেছেন কিছু টাকা আর বিক্রি দেখাতে পারলে তিনি আরও বিক্রি করতে পারবেন। এক মিলিয়ন পিক্সেল বেচাটা তার স্বপ্ন। যারা কিনেছেন, তারা তার স্বপ্নের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এ রকম একটা উদাহরণ আমাদের দেশেও আছে। খুলনায় তিন বন্ধু মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ২০০৭-২০০৮ সালে। শুরুতে

তাদের দরকার ছিল ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এই টাকা তারা ৮০ জন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে নিয়েছেন। মাথাপিছু ২০০০ টাকা। বেশি নেননি। বলেছেন, এই টাকা দিয়ে তারা তাদের প্রতিষ্ঠান চালু করবেন। সবাই খুশি মনে দিয়েছেন।

অন্যদিকে ৪ হাজার ৭০০ ডলার পাওয়ার পর অ্যালেক্স তার মার্কেটিং প্ল্যান করেছেন। এখানে তিনি প্রচলিত ভুল করেননি। প্রথম তিনি মিডিয়ায় আসতে চেয়েছেন এবং সে জন্য তার পরিচিত মিডিয়া লোকদের কোনো তালিকা করেননি। তিনি হেঁটে একটি পিআর। কোম্পানির কাছে গেছেন এবং টাকা দিয়ে তাদের হায়ার করেছেন। যদি তিনি নিজে নিজে মিডিয়ার দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন, তাহলে তিনি কখনো বিবিসি আর গার্ডিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন না। পিআর কোম্পানি জানে কীভাবে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। বিবিসি আর গার্ডিয়ানের কারণে পরেরটুকু ইতিহাস। উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে, ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে মিলিয়ন ডলার হোমপেজের ৪০% লিংক আর কাজ করে না।

অ্যালেক্স অবশ্য ভার্সিটিতে ভর্তি হলেও এক বছর পরই ড্রপআউট হয়ে গেছেন। কারণ, তার জীবনের শিক্ষাই তাকে এগিয়ে নিয়েছে। নানা কিছু চেষ্টা করার পর ২০১২ সালে তিনি Calm নামের একটি অ্যাপ লঞ্চ করেন, যা গত বছর ৯২ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। তবে অ্যালেক্স এখন যা-ই করুন না কেন, ইন্টারনেট ইতিহাসের জায়গা বিক্রি করে তিনি নিজেই হয়ে গেছেন ইন্টারনেট ইতিহাসের অংশ।

মাত্র ৫০ ডলার খরচ করে বিশ্বের ইতিহাসে মাত্র পাঁচ মাসে মিলিয়নিয়ার হওয়ার গল্প খুব একটা আছে বলে আমার জানা নেই।

অ্যালেক্সের গল্প থেকে আমাদের কেউ কেউ কিছু একটা শিখতে পারবে। তবে বেশির ভাগই এই লেখা পড়ে বলবে, এই গল্প আমরা আগেই জানি। এ আর এমন কী! বাংলাদেশে তোআর এটা সম্ভব না!!!

তথ্যসূত্র

দ্য ফাউন্ডারস

পেপালের মূল গল্পে চোখ দিলে দেখতে পাই, ইলন মাস্ক, পিটার থিয়েল, রেইড হফম্যান, মাক্স লেভচিন আর অনেকে মিলে সৃষ্টি হলো 'পেপাল মাফিয়ার। পেপাল মাফিয়ারা একসময় সিলিকন ভ্যালির সবচেয়ে শক্তিশালী খেলোয়াড়ে পরিণত হলো এবং তারা নতুন যুগের। উদ্যোক্তাদের জন্য যেন এক নতুন টেমপ্লেটে পরিণত হলো।

পেপালের প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মীরা পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ হয়েছেন। বিলিয়ন ডলার স্টার্টআপের মালিক, কেউ হয়েছেন পুরস্কার বিজয়ী প্রযোজক, কেউ হয়েছেন সরকারি বড় কর্মকর্তা। তারা সবাই একসঙ্গে মিলে সিলিকন ভ্যালির সবচেয়ে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। ফেসবুক থেকে স্পেসএক্স, ইউটিউব থেকে ইয়েল্প, পালান্তির তোলিংকডইনসহ অনেক বড় টেক কোম্পানিকে উপদেশ দেওয়া, ফান্ড দেওয়া এবং গঠনের জন্য তারা অনেক বেশি ভূমিকা পালন করেছেন।

মজার ব্যাপার হলো পেপাল মাফিয়ার সবাই প্রথম কোথায় একসঙ্গে দেখা করেছিলেন, জানা নেই। মাফিয়া হওয়ার আগে তারা কোনো পরিচিত মুখ ছিলেন না, তারা ছিলেন পেপাল কোম্পানির এক অনিশ্চিত নির্মাতা। *The Founders: The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley* বইয়ে লেখক জিমি সনি তাদের একদম প্রথম দিকের ফান্ড পাওয়া থেকে

শুরু করে নানান উত্থান-পতনের গল্প তুলে ধরেছেন। প্রায় ১০০ ইন্টারভিউ এবং অগণিত নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে এই বইয়ে জিমি লিখেছেন, কীভাবে পেপাল মাফিয়ার উত্থান হলো, পাশাপাশি কীভাবে তারা সিলিকন ভ্যালির আকার বদলে দিলেন এবং কীভাবে তারা পুরো ইন্টারনেটের ব্যবহারকেই নতুন রূপ দিলেন। এটি এমন একটি সফলতার গল্প, যার মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তারা পাবেন অসীম অনুপ্রেরণা আর এগিয়ে যাওয়ার দুর্বার সাহস।

ইউ ক্যান হেয়ার মি নাও

বাংলাদেশি গ্রামীণ জনগণ সেলফোন কিনে একে অপরকে টাকার। বিনিময়ে সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি কোম্পানিকে আজ উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে, যাদের এখন বর্তমান বার্ষিক আয় প্রায় ২০০ মিলিয়ন। কিন্তু এ থেকে পুরো বিশ্ব কী শিক্ষা নিতে পারে? এই প্রশ্ন লেখক নিকোলাস পি সুলিভান তার গ্রামীণফোন সৃষ্টির পেছনে স্বপ্নদ্রষ্টা ও অনুঘটক, এক নতুন ধরনের উদ্যোক্তা ইকবাল কাদিরের গল্পে খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

গ্রামীণ ব্যাংক ও নরওয়ের কোম্পানি টেলিনরের পার্টনারশিপে কোম্পানি হলো গ্রামীণফোন, যারা যৌথভাবে ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার জিতেছে; যা উন্নয়নশীল দেশে ব্যবসা বৃদ্ধির পথের যেন এক নতুন ধারা উন্মোচন করে। বাহ্যিক জ্বলন ইঞ্জিন', অর্থাৎ যেন এমন এক শক্তির দ্বারা তৈরি, যে শক্তির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি সরকারের ওপর নির্ভরশীল থাকা দরিদ্র দেশেও লোক দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এই ইঞ্জিনের চালিকা শক্তির মূলত তিন উৎস, যার প্রথমটি হলো তথ্য ও প্রযুক্তি, পশ্চিম থেকে দক্ষ হয়ে যাওয়া উদ্যোক্তা এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী। গ্রামীণফোনের এসব গল্প নিয়ে নিকোলাস পি সুলিভানের বই ইউ ক্যান হেয়ার মি নাও।

দ্য এয়ারবিএনবি স্টোরি

এয়ারবিএনবির সাফল্য আর উন্নতির পেছনের গল্পটা রোমাঞ্চকর। এক অনলাইন লজিং প্ল্যাটফর্ম মাত্র এক দশকের মাথায় হয়ে ওঠে বিশ্বের অন্যতম বড় আবাসন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। সহপ্রতিষ্ঠাতা ব্রায়ান চেসকি, জো গেব্বিয়া ও নাথান ব্ল্যাচার্জিকের উদ্বেগজনক আইডিয়াটি ৫০০ বিলিয়ন ডলারের হোটেল ব্যবসা খাতকে ব্যাহত করে এবং নিজেদের কোম্পানির ভ্যালুয়েশনকে পরিণত করেছে ৩০ বিলিয়নে; যা হিলটনের চেয়ে বেশি এবং ম্যারিয়টের কাছাকাছি। এয়াববিএনবি ভ্রমণপিপাসুদের মনে এক ভালোবাসার জায়গা যেন। দখল করে নিয়েছে। একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ব্যবসা খাতকে জাগিয়ে তুলেছে এয়ারবিএনবি। ফরচুন-এর সম্পাদক লেগ গ্যালাগার এয়ারবিএনবির সাফল্যের সঙ্গে এর গল্পের আরও বিতর্কিত দিকও আবিষ্কার করেছেন। বাসমালিক, ভ্রমণকারী, স্থানীয় সরকারের থেকে নিষেধাজ্ঞা থেকে শুরু করে সব বিতর্কের গল্পের পাশাপাশি এই বইয়ে এয়ারবিএনবির উত্থানের গল্পও এক করেছেন লেখক লেগ গ্যালাগার।

দ্য ফেসবুক ইফেক্ট

মাত্র দুই দশকের কিছু কম সময়ে ফেসবুক প্রায় ৩ বিলিয়ন গ্রাহক নিয়ে পরিণত হয়েছে নোবেল কোম্পানিতে। খুব কম সময়ে খুব বেশি উন্নতি ও প্রসারের দিক দিয়ে ইতিহাসে ফেসবুক অন্যতম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, সবাই ফেসবুককে কিশোরদের বা যুবকদের জন্য জনপ্রিয় হবে ভেবে থাকলেও বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ফেসবুকের প্রায় ৬৯ শতাংশ গ্রাহক পূর্ণবয়স্ক। ফেসবুকের সারা বিশ্বে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় নানা প্রভাবও বিস্তার করতে শুরু করে। কলম্বিয়া থেকে শুরু করে ইরানসহ অনেক দেশে রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে ফেসবুক।

ফেসবুকের উদ্ভব ও সাফল্যের রহস্যগাথা পেছনের গল্প থেকে ফেসবুক কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলছে, সে বিষয়ে রিসার্চ করেন ভেটেরান প্রযুক্তিবিষয়ক সাংবাদিক ডেভিড কিকপ্যাট্রিক।

তাকে এ কাজে পুরোপুরি সহায়তা করেন ফেসবুকের একদম শিকড়ের কিছু নির্বাহী কর্মকর্তা। কিকপ্যাট্রিক এই বইয়ে উল্লেখ করেছেন ফেসবুক কীভাবে সৃষ্টি হয়, কীভাবে ফেসবুক এত সাফল্য পেল এবং ফেসবুকের পরবর্তী সময়ে কী করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি এই বইয়ে উল্লেখ করেছেন ফেসবুকের ভুল সিদ্ধান্তগুলো কী। ছিল, পাশাপাশি তিনি ফেসবুকের মূল প্রধান ব্যক্তি মার্ক জাকারবার্গের ফেসবুকে ভূমিকা সম্পর্কেও পাঠকদের স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। তিনি ফেসবুকের গল্পের সব খুঁটিনাটি এখানে এক করেছেন, যা হয়তোঅন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। কীভাবে এক ১৯ বছর বয়সী হার্ভার্ড ছাত্র একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন, যা ইন্টারনেট দুনিয়া বদলে দিল? কিকপ্যাট্রিক দেখিয়েছেন এখানে যে মার্ক জাকারবার্গ তিনি কোম্পানির লাভের চেয়ে কোম্পানির বিস্তারে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, যাতে করে ফেসবুক একদিন বিশ্বজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়াজগতে নেতৃত্ব দিতে পারে। মার্ক জাকারবার্গ এবং আরও কিছু সহকারী মিলে বানানো ফেসবুক যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে এনেছে এক পরিবর্তন। বিশ্বব্যাপী মার্কেটিং, বিনোদন, যোগাযোগ, ব্যবসা থেকে শুরু করে সব জায়গায় ফেসবুক আমূল প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এর সঙ্গে তাদের নিজস্ব পরিচয় ঠিক ধরে রেখেছে। এটাই 'দ্য ফেসবুক ইফেক্ট।

দ্যাট উইল নেভার ওয়ার্ক

একসময় ইট-ও-মর্টার ভিডিও স্টোরগুলো রাজা ছিল। লেট ফি সর্বব্যাপী, ভিডিও স্ট্রিমিং তখন কেউ শোনেনি এবং ডিভিডি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপার যেন উড়ন্ত গাড়িগুলোর মতোই আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল। মার্ক র্যান্ডলফের মাথায় ডিভিডি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপার আসে। তবে এটি ছিল অনেকগুলো অদ্ভুত ও অলাভজনক চিন্তার মধ্যে একটি লাভজনক আইডিয়া। তারপর এক সকালে র্যান্ডলফ রিড হ্যাসটিংসকে পিচ করে তার এই আইডিয়া। এরপর এই আইডিয়া নিয়েই কাজ শুরু করে।

এই জুটির মধ্যে রিড হ্যাসটিংস খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন এ ব্যবসায় ও রিডই ছিলেন প্রথম বিনিয়োগকারী এবং র্যান্ডলফ ছিলেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী। এখন দেড় মিলিয়নের বেশি গ্রাহক নিয়ে নেটফ্লিক্সের জয়জয়কার। তবে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিপর্যয়কর স্টার্টআপটি শুরু হয়েছিল কয়েকজন বিশ্বাসী, হার না মানা লোক নিয়ে। পাশাপাশি অনেক বিপর্যয়ও ছিল। মার্ক র্যান্ডলফ তার নিজের মাকে প্রথম দিকের বিনিয়োগকারী হিসেবে রাজি করানো থেকে শুরু করে, সার্ভার লঞ্চের। দিন সার্ভার ক্রাশ করা, ব্লকব্লাস্টারকে অধিগ্রহণ করতে বলা পর্যন্ত ছিল এক চরম চড়াই-উতরাইয়ের গল্প। মার্ক র্যান্ডলফ ছিলেন অনন্য, তিনি হাল ছাড়েননি। এমনভাবে কাজ করেছেন যেন যে আইডিয়া কোনো দিন কাজ করবে না, তা নিয়েও তিনি সফল।

এভাবে যা উদ্ভূত হয়েছে, তা কেবল বিশ্বের অন্যতম আইকনিক সংস্থার অভ্যন্তরীণ গল্প নয়। বিপরীত ধারণাগুলোতে পূর্ণ এবং দ্বিখণ্ডিতযোগ্য গদ্যে লিখিত, এটি ব্যবসায় বা জীবনে বিশ্বাসের মাধ্যমে সাফল্যের চূড়ায় এই লাফিয়ে ওঠা আমাদের কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়— আপনি কীভাবে শুরু করবেন? আপনি হতাশা ও ব্যর্থতার আবহাওয়া কীভাবে গ্রহণ করবেন? সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থতা আপনি কীভাবে মোকাবিলা করবেন? সাফল্য কী কী? আর এসব উত্তর এককাট্টা করেছেন লেখক এই বইয়ে নেটফ্লিক্সের গল্প থেকে।

নো রুলস রুলস

কখনো কোনো দিন নেটফ্লিক্সের মতোকোনো কোম্পানি ছিল না। নেটফ্লিক্স যদিও বিনোদনজগতে কোনো বিপ্লব ঘটায়নি, তবে ১০০ মিলিয়ন মানুষের কল্পনা সংগ্রহ আর ভালোবাসায় ভর করে প্রায় ১৯০ দেশে ছড়িয়ে পড়ে নেটফ্লিক্স। ১৯৯৮ সালে স্থাপিত নেটফ্লিক্স ছিল এক ডিভিডি ভাড়া দেওয়া কোম্পানি, যাকে এই সাফল্যের চূড়ায় উঠতে নিজেকে ঢেলে বারবার সাজাতে হয়েছে।

নেটফ্লিক্সের এই সাফল্য কোনো দিন হয়তোআসতই না, যদি না কোম্পানির পাল্টা ও মৌলিক ব্যবস্থাপনার নীতি রিড হ্যাসটিংস

প্রণয়ন না করতেন একদম শুরুতেই। রিড হ্যাসটিংস চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার নীতি থেকে বেরিয়ে এসে কর্মীদের স্বাধীনতা ও তাদের দায়িত্ববোধের প্রতি বেশি জোর দেন। রিড় যেন এক নতুন ধারা নিয়ে আসেন, যেমন তিনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী লোককে মূল্য দেন, দক্ষতার চেয়ে উদ্ভাবনের ওপর জোর দেন, পাশাপাশি কর্মীদের ধরাবাঁধা নিয়মে নিয়ন্ত্রণ না করে তাদের কাজের বিষয় শুধু ঠিক করে দেন। নেটফ্লিক্সে ছুটি বা ব্যয়ের কোনো নীতিমালা নেই। এখানে আপনাকে গদগদ ভাষায় কথা বলে বসকে খুশি করার চেষ্টা করার কোনো দরকার। নেই; বরং আপনি শুধু কাজের সঠিক প্রতিক্রিয়াটা জানালেই হবে। যখন হ্যাস্টিংস ও তার দল প্রথম এই অপ্রচলিত নীতিগুলো তৈরি করেছিল, তখন এর অর্থগুলো অজানা ও অপরীক্ষিত ছিল। তবে মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে, তাদের পদ্ধতিগুলো অতুলনীয় গতি ও সাহসের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল এবং নেটফ্লিক্স দ্রুত বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে পরিণত হয়ে যায়।

এখানে প্রথমবারের মতো, *দ্য ম্যাপ*-এর সর্বাধিক বিক্রীত লেখক এবং বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যবসায়িক চিন্তাবিদ হ্যাসটিংস এবং এরিন মায়ার নেটফ্লিক্স মানসিকতার কেন্দ্রস্থলে বিতর্কিত মতাদর্শের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন, যা ফলাফল তৈরি করেছে ব্যবসায়িক বিশ্বের অন্যতম বড় প্রতিষ্ঠান। বিশ্বজুড়ে বর্তমান ও অতীতে নেটফ্লিক্স কর্মীদের সঙ্গে শত শত সাক্ষাৎকার এবং হ্যাসটিংসের নিজস্ব ক্যারিয়ার থেকে বিচার ও ত্রুটির গল্প আগে কখনো বলা হয়নি। *নো রুলস রুলস* বইটি নেটফ্লিক্সের বিধিগুলোর বহিঃপ্রকাশ।